বাংলা পড়ানো

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতী ভবন
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীত্রিষ্টুপ মুখোপাধ্যায়
ভারতী ভবন
১১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৩৫০
মূল্য দেড় টাকা মাত্র

মুদ্রাকর
শ্রীঅজিতকুমার বসু বি, এ
শক্তি প্রেস
২৭৷৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

'বাংলা পড়ানো' সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া ভূমিকার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। আমাদের দেশে সাহিত্যচর্চা যে একেবারে হয় না, একথা বলিতে পারি না; কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ে যে ভাবে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা সাহিত্যচর্চার অনুকূল নহে। মাতৃভাষার প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি, জাতীয় সাহিত্যের প্রতি আমাদের অকৃত্রিম অনুরাগ, কিন্তু সেই ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষা যাহাতে সুন্দর ও সার্থক হয় সে দিকে আমাদের দৃষ্টি কোথায়!

যাহারা এখনকার দিনে শিক্ষকতা শিক্ষা করিতে আসেন, তাহারা সৌভাগ্যক্রমে বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসেন, এবং হয়তো সেই জন্য আমাদের মধ্যে মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব ক্রমেই সঞ্চারিত হইয়াছে। 'বাংলা পড়ানো' বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাবৃত্তি পরীক্ষার অন্যতম বিষয়। ব্যবস্থার পরিবর্তনে এই বিষয়ের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। যতদূর জানি, শিক্ষকতার দিক হইতে এই বিষয়ের সাধারণ আলোচনা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ১৯৩৫ সালে জুলাই মাসে যখন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাবৃত্তি শিখাইবার জন্য নূতন ব্যবস্থা হইল, তখন হইতে এ পর্যন্ত আমি এ বিষয়ের পঠন-পাঠনায় অল্পবিস্তর ব্যাপৃত আছি। আলোচনার মোটামুটি ফল সাধারণে প্রকাশিত হইলে যাহারা এই পথের পথিক তাঁহারা এ সম্বন্ধে উপযুক্ত পুস্তক রচনা করিতে পারিবেন, এই

ভরসায় বহুবিধ অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও 'বাংলা পড়ানো' প্রকাশিত করিলাম। যাঁহারা পরে এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন, আশা করি ইহাতে তাঁহাদের পথ খানিকটা সুগম হইবে।

শিক্ষকতা কবিত্বশক্তির মতই দুর্লভ; বক্তৃতা শুনিয়া, বই পড়িয়া, এমন কি চোখের সামনে আদর্শ দেখিয়াও যোগ্যতা অর্জন করা যায় না। কিন্তু যাঁহাদের যোগ্যতা আজ সুপ্ত, তাঁহাদের পথ দেখাইবার পক্ষে অযোগ্য হস্তে ধৃত আলোক-বর্তিকাও যথেষ্ট। তাঁহারা নিজের আলোতেই পথ চলিবেন, অথবা পথ খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইবেন, অন্যের আলো তাঁহাদের একটু আধটু সাহায্য করিবে মাত্র। শিক্ষকদের পক্ষে কোনও ধরাবাঁধা প্রণালীতে চলা সকল সময় সম্ভব হইয়া উঠে না; শুধু উপদেশ দিলে বা উপদেশ পাইলে তাঁহাদের কোনও লাভক্ষতি নাই; স্থান কাল পাত্র ভেদে উপদেশ কাজে লাগাইবার দায়িত্ব তাঁহাদেরই।

এই প্রসঙ্গে দুইটি মন্তব্য উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। আমার আশা, শিক্ষকেরা সাহিত্য পড়াইতে গিয়া মন্তব্য দুইটি স্মরণ রাখিবেন। একটি রসবোধের সাধনার দিক দিয়া আমাদিগকে সতর্ক করিতেছে, অন্যটি সাহিত্য-শিক্ষকের পক্ষে সাহিত্য সাধনার প্রয়োজনীয়তা দেখাইতেছে।

"একালে সাহিত্যের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা একটা মস্ত ভুল ধারণা অনুসারে করা হয়। ও বস্তুর যেন একটা বাঁধা তালিকা আছে, সেটা যেন-তেন-প্রকারেণ যত শীঘ্র সম্ভব আদ্যোপান্ত চোখ বুলিয়ে সঙ্গে করে গলাধঃ-করণ করা চাই, যাতে "ফেল মারতে" না হয়; তারপরে জন্মের মত তার সঙ্গে এবং আর আর পড়াশুনার সঙ্গে দেনা-পাওনা চুকিয়ে শোধবোধ হয়ে যায়, চিরজীবন আর ভুলেও সেদিকে মন যায় না। এই রকম করে সব শিখতে এবং সব শেখাতে গিয়ে, কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অজ্ঞতার ফাঁক না দিলে, ফলে আনুষ্ঠানিক জ্ঞান লাভ হয় বটে, কিন্তু ছাত্রের মনে সাহিত্যের

রসবোধ কিছুমাত্র জন্মায় না; সাহিত্য কতকগুলি শুষ্ক তথ্য ও সূত্রের সমষ্টিতে পর্যবসিত হয়, এবং যে সকল রচনার ব্যাখ্যা তাতে করা হয়, সেগুলির প্রতি শিক্ষিতদের চিত্তে স্বভাবতই বিতৃষ্ণা জন্মাবার কথা।"*

"সাহিত্যচর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মনের উৎকর্ষসাধন ও চিত্ত-বিনোদন। অবশ্য শুধু সৌখীন ও সহজভাবে সাহিত্য পাঠ না করে যাঁরা শিক্ষা দেবার জন্য পাঠ করতে চান, তাঁদের নিজের জ্ঞানকে বিধিবদ্ধ করতে হবে, ব্যবস্থাপূর্বক বিদ্যানুশীলন করতে হবে, অপেক্ষাকৃত নির্দিষ্ট, নির্ভুল, এমন কি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অধ্যয়ন করতে হবে, তা স্বীকার করি। কিন্তু দুটি জিনিষের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা চাই;—একটি হচ্ছে এই যে, তিনিই সাহিত্যের সদ্‌গুরু, যিনি নিজের মনে প্রধানতঃ সাহিত্যরস উপভোগ করবার ক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে উদ্যোগী হবেন ও তাদের মনের গতি এমন দিকে ফেরাতে পারবেন যাতে চিরজীবন তারা সাহিত্যকেএক দিকে বুদ্ধিবৃত্তির সঞ্জীবনী রসায়ন,অপরদিকে কর্মজীবনের অবকাশের নর্ম সচিবস্বরূপ মনে করবে। এই গন্তব্যস্থানে পৌছানোই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত,—কেবল তাদের পরীক্ষার দিনের উপযোগী কাটাছাঁটা উত্তর যোগানো নয়। আর একটা স্মর্তব্য কথা হচ্ছে এই যে কেউ তাঁর শিক্ষাকে এই প্রকারে সফল করে তুলতে সক্ষম হবেন না, যদি তিনি পণ্ডিত হবার আগে নিজেই সখের সাহিত্যিক না হয়ে থাকেন; আজ যে সাহিত্যকে অপরের উন্নতি-সাধনের উপায়স্বরূপ ব্যবহার করছেন, এক সময়ে সেটিকে যদি তিনি নিজের উৎকর্ষ সাধনের কাজে না লাগিয়ে থাকেন; সাহিত্য-রচনা সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করেছেন সে সব যদি তিনি নিজেই আরও ভাল করে বোঝবার উদ্দেশ্যে, বুঝে আরো বেশী উপভোগ করবার উদ্দেশ্যে, না করে থাকেন।"— *

* সাহিত্যচর্চা, সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

এই ক্ষুদ্র পুস্তকের দুইটি প্রকরণ "শিক্ষা" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তক প্রণয়নে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত অনাথ নাথ বসু ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়াছি, তাহা সানন্দে স্বীকার করিতেছি। শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী সকলের চেষ্টায় 'বাংলা পড়ানো'র আলোচনা অগ্রসর হইলে সুখী হইব। এখনও পুস্তক প্রকাশিত করিতে গিয়া এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অমূল্য বাণী স্মরণ করিয়া সঙ্কুচিত হইতেছি :—

"নূতন প্রণালীতে কেমন করিয়া ইতিহাস মুখস্থ সহজ হইয়াছে বা অঙ্ক কষা মনোরম হইয়াছে সেটাকে আমি বিশেষ খাতির করিতে চাই না। কেননা আমি জানি আমরা যখন প্রণালীকে খুঁজি তখন একটা অসাধ্য সস্তা পথ খুঁজি। ......ঘুরিয়া ফিরিয়া যেমন করিয়াই চলি না কেন শেষকালে এই অলঙ্ঘ্য সত্যে আসিয়া ঠেকিতেই হয় যে, শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষার বিধান হয়—প্রণালীর দ্বারা হয় না। মানুষের মন চলনশীল এবং চলনশীল মনই তাহাকে বুঝিতে পারে।......শিশু বয়সে নির্জীব শিক্ষার মতো ভয়ঙ্কর ভার আর কিছুই নাই,—তাহা মনকে যতটা দেয় তাহাকে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশি। ...আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি, যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন; আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি, যিনি আমাদের চিত্তের গতি পথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া হৌক সকল দিকেই আমরা মানুষকেই চাই; তাহার পরিবর্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোনো কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।"

বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতগৌরব প্রবীণ জ্যোতিষী ভাস্করাচার্যও এই ধরণের কথাই বলিয়াছিলেন,—"ধী-যন্ত্রই মানুষের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র।" আমরা প্রণালীর চর্চা করিতে গিয়া তাহাকে যেন কখনও মানুষের ধী-শক্তি

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান না দিই, অন্যের বুদ্ধির সাহায্য লইতে গিয়া নিজের বুদ্ধির অপমান যেন না করি, একদিকে দাম্ভিকতা অন্যদিকে পরনির্ভরতা, এই উভয় দোষ হইতে শিক্ষকের কল্যাণকর বুদ্ধি যেন মুক্ত থাকে।

বৈশাখ, ১৩৪৮
১, ডোভার লেন, বালিগঞ্জ
কলিকাতা

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় প্রতিষ্ঠা যাঁহার
অন্যতম ব্রত, শিক্ষকদিগের শিক্ষার জন্য যিনি
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ ব্যবস্থা
প্রবর্ত্তন করিয়াছেন,
শিক্ষাসংস্কারে সর্ব্বদা উদ্যোগী
ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
মহাশয়ের করকমলে

সূচী

বাংলা পড়ানো

১

বিদ্যালয়ে এত কিছু শিখিবার বিষয় থাকিতে বাংলাকে আবার স্থান দেওয়া হইল কেন, বাংলা শিখিব কেন, এই প্রশ্ন যদি কেহ করেন তবে সে প্রশ্ন অসঙ্গত হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে আমরা ইস্কুলে বাংলা পড়ি ও পড়াই গতানুগতিক ভাবে—যেমনটি চলিয়াছিল তেমনই চলিবে, তাহার উদ্দেশ্য কি, কি ভাবে চলিতেছিল, এসব প্রশ্নে আমাদের অধিকার নাই। যাহাদের বয়স হইয়াছে, তাহারা তো প্রশ্ন করিবার মত কৌতূহল রাখেই না, আর যাহাদের বয়স হয় নাই, সেই কোমলচিত্ত বালকবালিকা এ সকল প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামায় না,—অনুকরণের ইচ্ছা তাহাদের মনে এত স্বাভাবিক যে তাহারা প্রশ্ন করে না, অনুকরণ করে। তথাপি আমাদের প্রথম প্রশ্ন হওয়া উচিত,—

"বাংলা পড়িব কেন?"

ব্যাকরণের মত শাস্ত্র আলোচনার সময় পতঞ্জলি প্রথমেই প্রশ্ন উঠাইলেন, 'কিমর্থমধ্যেয়ং ব্যাকরণম্'? 'ব্যাকরণ কেন পড়িব?' তাঁহার প্রশ্ন অনুসরণ করিয়া আমরাও কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি না—বাংলা তো মাতৃভাষা, বিদ্যালয়ে আবার বাংলা পড়িব কেন? পড়াইবই বা কেন?

আর যদি নিতান্তই ইংরেজির দেখাদেখি পড়িতে হয়, তাহা হইলে সে জন্য শিক্ষকের বিশেষ কোনও শিক্ষা বা যোগ্যতার প্রয়োজন নাই, বাংলা যাঁহার মাতৃভাষা এমন যে-কেহ কি আমাদিগকে বাংলা পড়াইতে পারিবেন না ? মনে পড়ে, অনেক বৎসর হইল ঢাকা কলেজে একবার একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, ইংরেজ অধ্যক্ষ বিজ্ঞানে পণ্ডিত, তিনি ইংরেজি সাহিত্যও পড়াইতেন ; বিভাগীয় পরিদর্শক আসিয়া তাহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, Can a coolie teach English ? মাতৃভাষা হইলেই হইল না, সে ভাষার প্রকৃতি জানা চাই, তাহার সাহিত্যের সহিত পরিচয় থাকিলে তাহার বৈশিষ্ট্য জানিলে তবে তাহাতে শিক্ষাদানের যোগ্যতা মিলিতে পারে। আমরা বাংলার শিক্ষকের উপযুক্ত মূল্য, কি অর্থে কি সম্মানে, কোনও দিক দিয়াই দিতে চাইনা ; রাজভাষাকে ও রাজভাষার শিক্ষককে তদপেক্ষা অনেক অধিক মূল্য দিয়া থাকি। মূলে ঐ একই প্রশ্ন,—বাংলা শিখিব কেন ? ইহাতে শিখিবার কি আছে ?

বাংলা পড়িব, বাংলা শিখিব, কারণ উহা মাতৃভাষা। কবি গাহিয়াছেন, 'বিনে স্বদেশী ভাষা, পূরে কি আশা ?' সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ নাকি আঠারটি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন ; বাংলার অমর কবি মধুসূদন দত্তেরও ভাষাজ্ঞান বড় কম ছিল না। আমাদের মধ্যে এমন পণ্ডিত কেহ কেহ জন্মিয়াছেন, যাঁহারা মাতৃভাষা অপেক্ষা বিদেশী ভাষায় অধিক বিচক্ষণতা, অধিক যোগ্যতা, অধিক কবিত্বশক্তির পরিচয়

দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প, আমরা আঙ্গুলে গুণিতে পারি। আমাদের পক্ষে মাতৃভাষায় শিক্ষার যে প্রয়োজন, সে প্রয়োজন হইল মনকে পূর্ণ করিবার। আমরা মানুষ, সামাজিক জীব, দশজনার সঙ্গ না হইলে আমাদের চলে না, বাংলা না শিখিলে দশজনার ভাব ও ভাষা আমরা বুঝিতে পারিব না। দেশের অতীতের বাণী ও বর্তমান যুগে আমাদের স্বজাতীয়দের উদ্দেশ্য আমাদের বুঝিতে হইবে। সমাজকে বুঝিতে হইলে সমাজের ভাষা জানা চাই। আমরা বাংলা শিখিব, কারণ বাংলা সাহিত্যই আমাদিগকে প্রকৃত সহৃদয়তা শিখাইবে, দশজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে ও কাজ করিতে শিখাইবে,—আর আমাদের সেই শিক্ষা কত-দূর সার্থক হইতেছে তাহা আমাদের সহৃদয়তার পরিমাণ হইতে বুঝিতে পারিব ; জীবনের ক্ষেত্রে সহৃদয়তার পরীক্ষা দিবার বহু সুযোগ মিলিবে।

বাংলা বলিতে আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, এই দুই-ই বুঝি। ভাষার প্রকৃতি, ভাষা প্রয়োগের কৌশল, রচনা ও অনু-বাদ ইত্যাদি শিখিতে ও শিখাইতে হইবে ; সেই সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের রসবোধ যাহাতে বাড়ে, তাহাও দেখিতে হইবে। উভয় ব্যাপারেই বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে নিতান্ত উপেক্ষা করিলে চলিবে না ; আমাদের এ সকল বিষয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষাই যে ভিত্তি, তাহার উপরই পরবর্তী জীবনের সৌধ গড়িতে হয়। অবশ্য এমন অনেকে আছেন যাঁহারা বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে আসেন নাই বা আসিতে পারেন নাই, অথচ দুর্লভ

কবিত্ব-শক্তির অধিকারী হইয়াছেন অথবা সাহিত্যের প্রকৃত বোদ্ধা হইতে পারিয়াছেন। দৃষ্টান্তের জন্য অধিকদূর যাইতে হইবে না—প্রাচীনকালে তো এরূপ বহু লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়,বর্তমান যুগেও তাঁহাদের সংখ্যা বড় কম নহে—রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হন নাই, শরৎচন্দ্রের পাণ্ডিত্য স্বোপার্জিত। কিন্তু প্রকৃতিদত্ত শক্তিকে মানিয়া লইয়াও বলা যায় যে আমাদের হাতে যে সময় ও সুযোগ দেওয়া হইয়াছে তাহার সদ্ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন—নূতন যুগে নূতন ব্যবস্থার ফলে আমরা কত কি করিতে পারিয়াছি তাহার বিচার হইবে ভাবী কালের সম্মুখে।

আমাদের সাহিত্য আজ নিতান্ত অগৌরবের নহে। সম্প্রতি এলাহাবাদের অ্যাংলো-বেঙ্গলী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের পুরস্কার-বিতরণী সভায় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ পাওয়েল প্রাইস বলিয়াছেন,—"বাংলা সাহিত্য একটি প্রাণবন্ত সাহিত্য। এই ভাষায় বহু বড় বড় কবি ও লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে। আমি নিজে সর্বদাই এই ভাষাকে ভারতের ফরাসী ভাষা বলিয়া মনে করি।" প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্বে জনৈক বাঙ্গালী, যিনি বাংলা ও ফরাসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত, তিনি বলিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালীরা ভারতবর্ষের ফরাসী।" ইউরোপের সুক্ষ্ম রসবোধের কেন্দ্র হইল ফরাসী জাতি; জ্ঞানের সাধনায় প্রতিবেসী জার্মান ও ইংরেজ জাতির ক্ষমতা যথেষ্ট বটে,—বাণিজ্য ব্যবসার ভাষা হিসাবেও ফরাসী ভাষাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা যায় না, কিন্তু যে সূক্ষ্ম রসবোধের সঙ্গে মানবসভ্যতার

পূর্ণ বিকাশ জড়িত আছে, তাহা ইউরোপ পাইয়াছে ফরাসীর নিকট হইতে ; সুতরাং বাঙ্গালীকে ফরাসীর সঙ্গে তুলনা করা কম প্রশংসার কথা নহে। প্রাচীন বাংলার সম্বন্ধে আমরা এখানে বিশেষ করিয়া বলিতে চাই না ও বলিতে পারি না ; কিন্তু বর্তমান যুগে ভারতভাষাগুলির মধ্যে ইহা যে সমৃদ্ধতম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ একাই, শুধু ভারতে কেন, জগতের মধ্যে তাঁহার বিরাট্ ও সর্বব্যাপী সাহিত্য-প্রতিভা লইয়া সাহিত্যানুরাগীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। আর শুধু রবীন্দ্রনাথ নহেন, বঙ্কিম, শরৎ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ বর্তমানযুগের সাহিত্যিকগণের দানে ইহার প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি, তাঁহাদের বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গী জানা ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত হওয়া বাঙ্গালীমাত্রেরই কর্তব্য। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন,—

> নব-বঙ্গসাহিত্য বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম ক'রে অঙ্গ ও কলিঙ্গদেশেও স্বীয় প্রসার লাভ ও প্রভাব বিস্তার করছে। তা ছাড়া এমন কথাও শুনতে পাই যে, গুজরাটী মারাঠী হিন্দী প্রভৃতি হাল সাহিত্যের প্রধান সম্বল হচ্ছে বাংলা বইয়ের ভাষায় অনুবাদ।

গুজরাটী, মারাঠী, হিন্দী প্রভৃতি সাহিত্য এখন আর অনুবাদসর্বস্ব নহে, অনুবাদে বাংলাই তাহাদের একমাত্র, এমন কি প্রধান নির্ভরস্থলও নহে। তথাপি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পরম যত্নের বিষয়, উপেক্ষণীয় নহে ; বরং কোনও কোনও স্থানে বাংলার প্রভাব এত অধিক যে তাহা হইতে মুক্ত হইবার প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে

দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই বাংলা আমাদেরই ভাষা, আমাদেরই সাহিত্য, সুতরাং তাহার শিক্ষার আমাদের যত্ন চাই, সাধনা চাই।

ভাষা শিক্ষা অর্থে শুধু শব্দের অর্থ বুঝিলে চলিবে না; ব্যাকরণ, রচনা ও বিশেষ প্রকাশভঙ্গীও বুঝিতে হইবে। যাহারা মনে করেন যে বাংলা তো মাতৃভাষা, সুতরাং ইহাতে আবার শেখার কি আছে, তাঁহারা যদি বাংলায় নিজের নিজের ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদেরও অনেক কিছু শিখিবার আছে। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কথা এখানেও উদ্ধৃত করিয়া দিই।

"মাতৃভাষাও যে একটা শিক্ষার বিষয়, এ জ্ঞান আমরা হারিয়ে বসে আছি। আমাদের ধারণা, এ বিষয়ে বাঙ্গালীমাত্রেরই অশিক্ষিতপটুত্ব আছে। সে পটুত্ব যে বেশীর ভাগ লোকের নেই, তা তাঁরা বাঙলা লিখতে বসলে অবিলম্বে আবিষ্কার করতে পারবেন।"

মানুষের মধ্যে শুধু যে বুঝিবার শক্তি আছে তাহা নহে, তাহার গড়িবার শক্তিও কম নহে, এবং তাহার উপযুক্ত উপাদান চাই। মাতৃভাষা সর্বাপেক্ষা নিকটতম ও সহজতম উপাদান। অনবরত তাহার চর্চা চলিতেছে। এই চর্চায় নৈপুণ্য লাভ করিতে হইলে উপাদানের সম্যক্ জ্ঞানের প্রয়োজন, এবং চর্চাও যে কি ভাবে করা উচিত তাহা শিক্ষা ও আলোচনার প্রয়োজন।

তাই অন্যান্য শিক্ষণীয় বস্তুর মত বাংলাও পড়িতে হইবে, শিখিতে হইবে, শিখাইতে হইবে। যদি বাংলা না শিখি; তাহা

হইলে আমাদের মনের অনেক বৃত্তি অপরিণত থাকিয়া যাইবে, অথবা অস্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিবে। আমাদের হাতের কাছে যে সব অস্ত্র আছে তাহাদের প্রয়োগকৌশল না জানিলে দুর্বল হইয়াই থাকিতে হয়। শক্তি অর্জন করা আর দুর্বল হইয়া থাকা,—মাঝামাঝি কোনও পথ, কোনও মধ্যপন্থা নাই।

"বাল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গেসঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, আমরা বেশ সহজ মানুষের মতো হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি। ....আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রকার মনোযোগের বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে।

কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে ?— বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য।"—রবীন্দ্রনাথ

বাংলা শিক্ষকের দায়িত্ব অন্য কোনও বিষয়ের শিক্ষকের দায়িত্ব অপেক্ষা কম নহে। তাঁহাকে সেইজন্য অগ্রসর হইয়া চলিতে হইবে, পিছাইয়া পড়িলে চলিবে না ; বিদ্যার চর্চায় সর্বদা অভিনিবেশ না থাকিলে তিনি নিজের তো ক্ষতি করিবেনই, সঙ্গে সঙ্গে যাহাদের ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছে তাহাদের দিকটাও অবহেলা করিবেন—ইহাতে জাতীয় ক্ষতি। তাঁহার নিকটে চাই সাহিত্যের রসবোধ; শিখাইবার আগ্রহ, ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি। বিদ্যায় ও বিদ্যাদানে অনুরাগ,

ছাত্রদের জন্য পরিশ্রম করিবার আন্তরিক ইচ্ছা ও ক্ষমতা, তাঁহাকে সরস রাখিবে এবং তাঁহার যত্নকে সার্থক করিয়া তুলিবে।

২

সেকালে ছাত্র পাঠশালায় গিয়া দাগা বুলাইত ; শিক্ষক বা গুরুমহাশয় আগে লিখিয়া দিতেন, তাহার পর ছাত্র সেই লেখার দাগগুলিতে চক বা চা-খড়ি দিয়া বা খাগের কলম দিয়া দাগ বুলাইয়া যাইত ; তাহাতেই তাহার হইত লেখার অভ্যাস, 'হাতে খড়ি'। বর্ণপরিচয় ও হাতে খড়ি এক সঙ্গেই চলিত। স্বরে অ স্বরে আ ইত্যাদি বলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখাও শেখান হইত।

এখন আমরা লেখা ও পড়া, দুইটির বিষয়েই আরও সতর্ক হইয়াছি। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ এখন আর মুখস্থ করিলে কোনও প্রশংসা মিলে না ; বরং অতি সহজে চিনিতে পারাতেই প্রশংসার দাবী। দিন দিন স্বর, ব্যঞ্জন প্রভৃতি সংজ্ঞাও অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইতেছে, প্রথম শিক্ষার্থীর নিকটে ; আমাদের চেষ্টা হইতেছে যে পড়ুয়ারা শুধু কথার কথা না শিখিয়া, যাহা প্রয়োজনীয় তাহাই শিখুক। আমরা লেখাও শিখাইব, পড়াও শিখাইব, কিন্তু উভয়ে জট পাকাইব না।

বর্ণপরিচয়ের ব্যাপারেই দেখা যাক। অজগর, ঈগল, ঋষি,উট, ৯কার প্রভৃতি শব্দে শিশুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তাহার

পরে আমরা তাহাকে শব্দ শিখাই, তাহার পর শব্দগুলি দিয়া বাক্য রচনা করি। 'ঌকার যেন ডিগ্‌বাজি খায়', কি 'অজগর আস্‌ছে তেড়ে'—এসমস্ত আমাদের মুখে মুখে ছড়ার আকারে থাকে, যাহারা শিখিতে আসে তাহারা শিখিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে ইহাদের জীবনে সত্যকার কোনও যোগ থাকে না।

এরূপ প্রণালীতে পড়ুয়ারা অক্ষরের স্বাভাবিক রূপ পায় না—পরিচিত শব্দের মধ্যে তাহাদের দেখিতে পায় না, তাহারা নিজেদের জ্ঞানকে কাজে লাগাইতে পারে না। অজগর সাপ বা ঈগল পাখির সঙ্গে অতি অল্প বালকেরই পরিচয় আছে বা থাকে; ঌকারের সঙ্গে তো কাহারও কোনও পরিচয়ই থাকিবার কথা নয়। শুধু শুধু বর্ণপরিচয়ের প্রধান দোষ ইহাই—শব্দ হইতে বিযুক্ত করিয়া ইহা বর্ণকে দেখায়, তাহাতে বর্ণপরিচয় হয় প্রাণহীন কলের মত।

শব্দের মধ্যে যে অক্ষর, আমরা তাহাই উচ্চারণ করি; শুধু 'স' বা 'হ' উচ্চারণ না করিয়া বলি, "সাহস"; শুধু 'ছ' বা 'ব' না পড়িয়া, পড়ি—'ছবি।' 'ছবিটি ভাল', 'ছবি দেখিতেছি' ——'কাল কত ছবি দেখিলাম'—এরূপ দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়া 'ছবি' বা 'ছ' ও 'ব' এর পরিচয় হওয়া স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

কেহ কেহ সহজে বর্ণপরিচয় করাইবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করেন। শিশুদের পরিচিত বস্তুর নাম বলিয়া বা বলাইয়া সেই সকল নামে যে শব্দ, তাহার মধ্য দিয়া তাঁহারা বর্ণপরিচয় আরম্ভ করেন। যেমন বল, কল, নল; শিশুদের

বল দেখান হইল; কলিকাতায় ও অন্যান্য শহরে জলের কল ছেলেরা বিস্তর দেখিয়াছে; নল দিয়া জল পড়ে। সেই নলও তাহাদের খুব পরিচিত বস্তু। সুতরাং 'বল' 'কল' 'নল' 'জল'—এই সব দেখাইয়া ও আঁকিয়া শব্দগুলির ধ্বনির দিকে ছেলেদের আকৃষ্ট করা যায়। প্রথমে কিন্তু বস্তু বা তাহার চিত্র দেখান চাই—তাহাতে তাহাদের শিক্ষা হইবে সহজ ও স্বাভাবিক। ছবি আঁকিয়া বা ছবি ছাপাইয়া তাহার পাশে থাকিবে ধ্বনিটি বা শব্দটি। ইহাই হইবে শিক্ষকের প্রথম 'চার্ট'। দ্বিতীয় চিত্রতালিকায় আঁকা ও লেখা থাকিবে—বক, বই, কই, মই, দই। এই সব বস্তু ও শব্দ শিশুদের অতি পরিচিত। এইরূপে অগ্রসর হইলে তাহাদের নিকট তৃতীয় 'চার্ট' দেওয়া হইবে। তাহাতে বড় বড় অক্ষরে কথা থাকিবে, যেমন—

কই বই
এই বই
জল কই
এই বক

তাহার পর অন্য বর্ণ ও আকারাদি যোজনার ফলে শব্দ বাড়িতে বাড়িতে যাইবে; যেমন—

দই	খই	মই
আদর	আখ	আম
দাদা	দিদি	দড়ি
গাছ	খড়ি	নদী

এই প্রকারে অগ্রসর হইলেই আমরা ছড়া শিখাইতে পারি :—

দই আর খই দাও
বই রাখ তুলে ;
কই মাছ ভাজা খেতে
শৈল গেছে ভুলে

কিংবা আতা গাছে তোতা পাখি
ডালিম গাছে মৌ
এত ডাকি তবু কথা
কওনা কেন বৌ।

এখানে শিক্ষককে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকিয়া বা জোগাড় করিয়া শিক্ষার্থীর নিকট ধরিতে হইবে, বস্তুনিরপেক্ষ বিদ্যাদান করিলে চলিবে না।

সব সময়ে ছড়ার সব কথার অর্থ নাও থাকিতে পারে। যেমন—

ডালিম গাছে পরভু নাচে
টাক্‌ডুমাডুম্‌ বাজনা বাজে।

'পরভু' কথাটার অর্থ যদি শিশুরা না-ও জানে, তাহা হইলেও তাহাদের আনন্দ কমিবে না।

ছড়ার প্রত্যেকটি বর্ণের সঙ্গে তাহাদের পূর্ব হইতে পরিচয় অবশ্য থাকা চাই।

মধ্যের ধাপগুলি সংখ্যায় কত হইবে, তাহা শিক্ষকের স্থান কাল পাত্র বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে। শব্দ ও

বাক্যের আকারেই আমরা নিশ্চয় অক্ষরকে স্বাভাবিক ভাবে দেখি—স্বতন্ত্রভাবে অক্ষরগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়না। সুতরাং প্রথমে শব্দ, তাহার পর অক্ষর ; বাক্য, তাহার পর আবার শব্দ—এই ভাবে শিখাইলে সহজ ও স্বাভাবিক হইবে।

'আজ রবিবার। আজ কাজ নাই। আজ কাকা বাড়ি যাবেন।' পর পর এইরূপ বাক্য লিখিয়া তাহা হইতে 'আজ' এই কথাটি বালকদিগকে চিনাইয়া দেওয়া হইল। যেখানে 'আজ' দেখিবে সেখানেই তাহারা দেখিয়া চিনিতে পারিবে ; তাহার পর ক্রমে ভাগ করিয়া লইবে—তখন পৃথক করিয়া বর্ণপরিচয় হইবে। এই ভাবেও বর্ণপরিচয় সম্ভব।

শিক্ষক সুবিধামত নানাপ্রকার সাজ সরঞ্জাম দিয়া বর্ণপরিচয় করাইতে পারেন। বড় কাঠের তক্তায়, কিংবা বাঁশের ছোট ফ্রেমে কাগজ আঁটিয়া তিনি চারিটি শোওয়া রেখা টানিলেন, চারিটি খাড়া রেখা দিয়া আবার তাহা ভাগ করিলেন; এইরূপে ষোলটি ঘর হইল। প্রথম চার ঘরে চারিটি অক্ষর বসাইলেন ধরা যাক—ন ট ব র। তাহার নীচের চারিটি ঘর ফাঁক থাকিল। ছাত্র এই ঘরগুলি পূর্ণ করিবে। বিস্তর অক্ষর এক একটি এক এক টুকরা কাগজে লেখা থাকিবে, ছাত্র 'ন' খুঁজিয়া বাহির করিয়া উপরে যে ন আছে তাহার নীচে বসাইবে। এইরূপে ট, ব, র সব বসিবে পর পর। এই জাতীয় কৌশল শিক্ষকের উদ্ভাবনী শক্তির উপর নির্ভর করিবে, তিনি প্রয়োজন মত উপকরণ সংগ্রহ করিবেন।

কেহ কেহ আবার গল্পের সাহায্যে, গল্পের আকর্ষণী শক্তির সুযোগ লইয়া বর্ণপরিচয় করাইতে চেষ্টা করেন। 'একজনের এক কলম ছিল। সে কলম সে রোজ লইয়া যাইত। সেদিন কলম ফেলিয়া আসিল। কলম না লইলে কাজ চলে কি? আর কাহারও কলম লইয়া আসিল। পরে তাহার কলম পাইল।' এইরূপে 'কলম' কথাটার সঙ্গে খুব পরিচয় হইল; সুতরাং যে 'কলম' কথাটি গল্পের কেন্দ্র, তাহার সঙ্গে শব্দ-যোজনা করিতে করিতে সে অনেক বর্ণ ই শিখিতে পারিবে। সঙ্গে সঙ্গে শব্দবিশ্লেষণ হইতে থাকিবে, 'কলম' যে 'ক' ও 'ল' ও 'ম' জুড়িয়া রহিয়াছে তাহাও সে বুঝিতে পারিবে।

আকার ইকার ও অন্যান্য বর্ণ যোজনা করিয়া শব্দের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। 'ক ল' কে কাল, কালা, কালি, লোক, সকল, নকল, সকাল ইত্যাদিরূপে বাড়াইয়া নূতন নূতন শব্দ শিক্ষা করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে য-ফলা ব-ফলা ইত্যাদি ফলা শিখানো চাই।

কোন পদ্ধতিতে বর্ণপরিচয় সহজে হইবে, তাহা ছাত্র কিরূপ, তাহাদের বয়স, শিক্ষকের উদ্যোগ ও ক্ষমতা, বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করিবে।

বর্ণপরিচয় প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। শিশুদের প্রথম পাঠ—সুতরাং যে সমস্ত শব্দ তাহারা ইহাতে পাইবে, সেগুলি তাহাদের পরিচিত হওয়া চাই। এবিষয়ে আমরা সমস্ত বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক এক ছাঁচে ঢালাই করিয়া লাভের চেয়ে ক্ষতিই করি বেশী। শহরে ছেলেমেয়ে-

দের চক্ষে যাহা পুরাতন, গ্রামের ছেলে মেয়েদের চক্ষে তাহা নূতনও হইতে পারে। 'মোটর গাড়ী ঐ ছুটেছে'—বলিলে বাংলাদেশের সর্বত্র বুঝিতে পারিবে। কিন্তু 'এক্কাগাড়ী ঐ ছুটেছে' সর্বজনবোধ্য নহে—এক্কা গাড়ীর ছবি আঁকিয়া তবে বুঝাইতে হয়।

তাই বলিয়া ছেলেরা কি নূতন শব্দ শিখিবে না? অবশ্যই শিখিবে; তবে একটু হিসাব করিয়া। স্বাভাবিক ভাবে তাহারা চারিদিক হইতে নূতন শব্দ শিখিবে, এমন শব্দ শিখিবে যাহা লোকে প্রয়োগ করে, যাহা তাহারা নিজেরাও প্রয়োগ করিতে পারে। এক শ্রেণীতে কত করিয়া শব্দ শিখিতে হইবে তাহার সংখ্যা একেবারে কষিয়া দিতে পারি না, তাহাতে সমস্ত শেখা ব্যাপারটাই হইয়া যাইবে কৃত্রিম, জীবনের সঙ্গে তাহার যোগ থাকিবে না। কিন্তু যদি আমরা তাহাদের শব্দসমষ্টি বৎসর বৎসর শ্রেণী হিসাবে মাপিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহাদের ভাষাজ্ঞানের উন্নতির একটা ধারা বুঝিতে পারা যাইত। আমাদের শিক্ষকেরা এদিকে দৃষ্টি দিলে ভবিষ্যতের আলোচনার জন্য পথ প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, যে সব শব্দ ছেলেমেয়েরা কখনও শোনে নাই, যাহার অর্থ তাহারা বুঝিতে পারে না বা বুঝিতে পারা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়, সেই সকল শব্দ মাঝে মাঝে দুই একটি শুনিলে বা শিখিলে মন্দ হয় না, তাহাদের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনারও তো খোরাক চাই। ধ্বন্যাত্মক শব্দের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া এই কথা মনে রাখা উচিত।

৩

শিশুদিগকে বর্ণপরিচয় করাইবার সঙ্গে সঙ্গে লেখাইবার কথা ওঠে। আমরা কথায়ও লেখাকে ও পড়াকে একত্র করিয়া বলি, 'লেখাপড়া'। তবে শিশুরা কখন লিখিতে শিখিবে, ইহাই হইল প্রশ্ন।

বর্ণমালা চিনিতে চিনিতে, শিশু তাহার অনুকরণে লিখিতেও শিখিবে, ইহাই স্বাভাবিক হওয়া উচিত। ভূদেববাবু সোজা-সুজি বলিয়া গিয়াছেন :—

'বাঙ্গালায় পড়া এবং লেখা একবারেই শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। এতদ্দেশীয় প্রাচীন পাঠশালা সমস্তে এই রীতি প্রচলিত আছে।......কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, কোমলমতি শিশুদিগকে একেবারে লেখা পড়া দুই ধরাইলে তাহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত ভার বোধ হইবে। ইহারা এমন বলিলেও পারেন যে একেবারে দুই পায়ে চলা বড় কঠিন ব্যাপার, অতএব প্রথমতঃ একপায়ে চলিতে শেখাই ভাল। বস্তুতঃ যাঁহারা একেবারে লিখিতে এবং পড়িতে শিখা এত বিষম ব্যাপার বোধ করেন, তাঁহারা কখনই বালকদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন নাই।.........ফলতঃ এই বিষয় উপলক্ষে অধিক বাক্য ব্যয় করা অনাবশ্যক। একেবারে লিখন এবং পঠন শিক্ষা দেওয়াতে যে বিশেষ ফল দর্শে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবে।"

ভূদেববাবুর মত যে সমীচীন সে বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য হইবে। শিশুরা পড়া অপেক্ষা কাজ ভালবাসে। তাহাদের পক্ষে শিক্ষকের দেখাদেখি লিখিতে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু

ভূদেববাবু যাহাদের দেখিয়া লিখিয়াছেন, তাহাদের পাঁচবৎসর বয়সের পূর্বে হাতে খড়ি হইত না। আজকাল কোথাও কোথাও বর্ণপরিচয় পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্বেও হয়; এমন কি, তিনবৎসর বয়সেও হয়। তখন হাত ঠিক চলেনা, হাতকে ঠিক চালাইতে হইলে শরীর ও মনের উপর জোর পড়ে; অগত্যা সে অবস্থায় পড়া ও লেখা একসঙ্গে হওয়া কঠিন এবং উচিতও নয়; আগে পড়া ও পরে লেখা,—তখনকার ব্যবস্থা হইতে পারে।

আমরা লিখিতে শিখাইবার সময় কতকগুলি বিষয় পূর্বে বিবেচনা করিতাম না, এখন বয়স হিসাবে ও লিখিবার উপ-করণ হিসাবে লেখার দিকটা শিক্ষাবিদ্‌গণের বিশেষ দৃষ্টিতে আসিয়াছে। লিখিতে শিখিবারও ধারা আছে; সেই ধারামত শিখানো দরকার। ইহাতেও চার পাচটি স্তর আছে, সেই স্তর অনুসারে শিখাইতে হইবে—কে কতদিন কোন স্তরে থাকিবে তাহা নির্ভর করিবে ছাত্রের শক্তি ও শিক্ষকের বিবেচনার উপর। আমরা আনুমানিক একটা হিসাব দিতে পারি মাত্র।

শিশুদের স্পর্শানুভূতি দিয়া তাহাদের লেখা আরম্ভ করা উচিত; পূর্বে এইজন্য দাগা বুলাইবার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষক বড় বড় করিয়া লিখিয়া যাইতেন, ছাত্র সেই লেখার উপরে আঙ্গুল দিয়া, নয়তো লেখনী লইয়া, চালনা করিয়া যাইত, তাহাতেই তাহার অভ্যাস হইত। আজকাল শিশুদিগকে প্রথমে অঙ্গুলি চালনায় অভ্যস্ত করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে

বালুকা সুলভ, সেখানে তাহার উপর দিয়া অঙ্গুলি চালানো সহজ; তাহাতে কাজ হয়! আমরা সহরে অন্য উপায় অবলম্বন করি, শিরিষ কাগজ বা sand-paper অক্ষরের আকারে কাটিয়া লই, শিশুদের বলি, তাহারা সেই অক্ষরগুলির উপর দিয়া অঙ্গুলি চালনা করুক, স্পর্শদ্বারা তাহাদের অক্ষরের আকৃতি সম্বন্ধে বোধ জন্মিবে। তাহাদের আঙ্গুল এইভাবে অভ্যস্ত হইলে তখন আর তাহাদের লিখিতে কোনও কষ্ট থাকিবে না।

ভূদেববাবু ছাত্রদের জন্য 'বৃহৎ কাষ্ঠফলক'-এর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এখন ব্ল্যাকবোর্ড প্রত্যেক ক্লাসেই রাখা হয়; এমন কি দেওয়ালে যাহাতে তাহা সহজে উঠানো নামানো যায়, তাহারও বন্দোবস্ত আছে। ভূদেববাবু লেখা শিখাইবার জন্য যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করি :—

"শিক্ষক বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে লিখিয়া এক একটী করিয়া প্রথমে দুই তিনটী স্বরবর্ণ এবং তাহার পর দুই তিনটী হল্‌বর্ণ লিখিতে এবং পাঠ করিতে শিখাইবেন। তৎপরে ঐ সকল অক্ষরের যোগে যে সকল শব্দ উৎপন্ন হয় তাহারও কতকগুলি লিখাইয়া পাঠ করাইবেন। এইরূপে সমুদায় বর্ণমালা এবং 'বানান' 'ফলা' শিক্ষিত হইলে, তাহার পর বালকেরা পরস্পর কথোপকথনে যে সকল সরল বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা লিখাইতে এবং পাঠ করাইতে হইবে। অনন্তর বালকদিগের হস্তে পুস্তক সমর্পণ করা যাইতে পারে। এইরূপে শিখাইলে লিখন পঠনে বিলক্ষণ আমোদ হইয়া অত্যল্পকালেই সুন্দররূপে অক্ষর পরিচয় হয়।"

'বৃহৎ কাষ্ঠফলক' অবশ্য বহুলোককে একত্র শিখাইবার

পক্ষে খুবই সুবিধার উপকরণ। শিশুরা ইহাতে শিক্ষকের লেখা দেখিতে পায়, নিজেরাও কেহ কেহ কাষ্ঠফলকের নিকট গিয়া লিখিয়া আসিতে পারে। কিন্তু তাহাদের লেখার পক্ষে সব চেয়ে সুবিধা, বাঁধান মেজের উপর রঙ্গীন 'চক' দিয়া। ইহাতে তাহাদের আমোদও হইবে. লেখার জন্য কষ্টকেও কষ্ট বলিয়া মনে হইবে না। শিশুশ্রেণীতে লেখাকে এই সামান্য উপকরণের মধ্যে আবদ্ধ রাখা ভাল। ইহাতে তাহাদের লেখা সুন্দর করিবার ঝোঁক সহজে জন্মিতে পারে।

বিদ্যালয়ের জীবনকে তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়,—শিশুশ্রেণী, বাল্যশ্রেণী, কিশোরশ্রেণী। যখন হাতে খড়ি হইল, তখন হইতে দুই তিন বৎসর শৈশবকাল. তাহার পর প্রায় তিন বৎসর বাল্যকাল, তাহার পরের তিনবৎসর কাল কৈশোরসময়। প্রত্যেক ব্যবস্থাতেই এই তিন ক্রমের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। লিখিবার প্রথম যুগ শৈশবের যুগ বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারি।

লিখিতে শেখা আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজ বলিয়া মনে হইলেও ইহা বাস্তবিক কিন্তু সহজ নহে। অনেকে অযত্নে শিখিয়াছেন, কিন্তু শিখিবার সময়ে যত্ন লইতে পারা যায়, এবং যত্ন লইলে লেখা ভাল হওয়াও সম্ভব। যখন শিশুরা শ্লেটে লেখে তখন তাহাদিগকে শ্লেট-পেন্‌সিল কি করিয়া ধরিতে হয়, খাড়া করিয়া না তেড়া করিয়া, তাহা বলিয়া দিতে হয়। শ্লেটে খাড়া দাগ ও তেড়া দাগ, তাহারা কাটিতে শিখিবে, শিক্ষক যেমন "বৃহৎ কাষ্ঠফলকে" দেখাইয়া দিবেন, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে

ছাত্রেরা শ্লেটে লিখিতে থাকিবে,—তাঁহারই দেখাদেখি। ক্রমে তাহারা পড়া, তেড়া' বাঁকা—সব রকম রেখাই—আঁকিতে শিখিবে। প্রথমে হাত হয়তো নড়িতে চাহিবে না, কিন্তু ক্রমশঃ তাহাদের অভ্যাস হইবে, এবং হাত লঘু হইতে থাকিবে।

ছোট জিনিষ ধরা ও তাহা চালনা করা শিশুর পক্ষে অনেক সময়ে কঠিন হয় তখন তাহার হাতে দিতে হইবে বড় খড়ি, যাহাতে সে মোটা মোটা দাগ দিতে পারিবে। শ্লেটের উপর খড়ি দিয়া লেখা খানিকটা অভ্যাস হইলে তবে তাহার হাতে শ্লেট-পেন্সিল দেওয়া সঙ্গত। খড়ির নানা বর্ণের সুদৃশ্য পেন্সিল আজকাল পাওয়া যায়। শ্লেট-পেন্সিলের পূর্বে তাহা অভ্যাস করা ভাল।

তাহার পর অক্ষর লিখিবার পালা। কেহ কেহ বীজ দ্বারা অক্ষর গঠনেরও পক্ষপাতী। কতকগুলি বীজ অক্ষরের আকারে সাজাইতে হইবে। শিশু ইহাতে হাতের কাজ পাইবে, তাহার চোখেরও খানিকটা শিক্ষা হইবে। বাংলাতে অক্ষরের মাত্রা আছে, তাহা এইবার শিখিতে হইবে। যে সমস্ত অক্ষর দেখিতে খানিকটা একরকম, সেই সমস্ত অক্ষরই প্রথমে লিখিতে হয়। যেমন **ব** সর্বপ্রথমে, তাহার পরে **ক**, **র**, **ধ**, **ঝ**, **চ**, **ছ**—ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের 'প্রথম পড়া'তে এরূপ লিখিতে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছড়াও আছে।

যেমন,— 'ঢ' লিখে ফোঁটা দিলে
ঢ় তারে কয়,

'ট'য়ে টিকি টেনে দিলে
'ট' হয়ে রয়।

শিশুরা ক্রমে পরিচিত বস্তু দেখিলে তাহা লিখিবার চেষ্টা করিবে। কতকগুলি ছবি ছাত্রদের দেখাইয়া তাহাদের নাম শ্লেটে লিখিতে বলাও মন্দ নহে। ধ্বনিকে অক্ষরে রূপান্তরিত করা ছাত্রজীবনের আর এক বিশেষ অধ্যায়।

প্রথম লিখিতে গেলে অক্ষরগুলির আকার যাহাতে এক সমান হয় তাহার জন্য দুইটি রেখা টানিরা সেই রেখার মধ্যে যাহাতে লেখা অক্ষরগুলি নিবদ্ধ থাকে, তাহা দেখিতে হইবে। এই অভ্যাস বেশ কিছুদিন ধরিয়া করানো প্রয়োজন। তাহার পর শুধু উপরের রেখা থাকিলেই চলিবে। শেষে তাহারা রেখা না টানিয়াও সমান আকারের অক্ষর লিখিতে পারিবে। ক্রমে সকলে, বইয়ে যাহা আছে তাহাও শ্লেটে লিখিতে পারিবে —এইরূপে তাহাদের পর্যবেক্ষণ শক্তির চর্চা ও পরীক্ষা হইতে থাকিবে।

ছাপা অক্ষর দেখিয়া তাহার মত লিখিতে শেখাই প্রথমে ভাল ; পরে যখন ছাত্র শিশুবিভাগ হইতে বাল্যবিভাগে যাইবে, তখন সে লেখা-অক্ষরের মতই লিখিতে শিখিবে। ক্রমশঃ তাহাকে শ্লেটের বদলে দিতে হইবে কাগজ ; পেন্‌সিলের ব্যবহারও তাহাকে শিখাইতে হইবে, কি করিয়া পেন্‌সিল কাটিতে হয়, কি করিয়া ধরিতে হয়। প্রথম প্রথম অনেকে জোর দিয়া লিখিবে, কিন্তু লিখিবার সময় জোর দেওয়ার

কোনও প্রয়োজন নাই, দাগ পড়াই দরকার এবং জোরে দাগ না পড়িয়া স্পষ্ট দাগ পড়ে, ভাল লেখার তাহাই কৃতিত্ব; এসব কথা তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে, এবং রীতিমত অভ্যাসও করাইতে হইবে।

ক্রমে ছাত্র বাল্যবিভাগ হইতে কিশোরবিভাগে উপনীত হইবে; ইহার পূর্বেই যদি তাহার হাতে কলম দেওয়া না হইয়া থাকে, তবে এখন তাহাকে কলম দিতে হইবে। অনেকে সর্বাগ্রে খাগের কলমে লেখা শিখাইবার পক্ষপাতী; খাগের কলমে লেখা শিখিলে তবে নিবের কলম ধরাইতে চাহেন। খাগের কলমে লেখার আকার স্পষ্ট হয়, নিবের কলমে অত স্পষ্ট হয় না বলিয়া প্রথম দিকে তাঁহারা খাগের কলম ধরাইতে চাহেন; পূর্বে ইহাই ছিল প্রচলিত প্রথা, কিন্তু এখন ইহার চেয়ে নিব হইয়াছে সুলভ। তবে প্রথমে সরু নিব না দিয়া মোটা নিব দেওয়াই উচিত।

কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিলেই শিখাইতে হইবে যে, বাঁ দিকে কিছু জায়গা যেন বাদ দিয়া লেখে। শিক্ষক প্রথম প্রথম এইজন্য দাগ কষিয়াও দিতে পারেন—'মার্জিন' এর ধারণা অন্ততঃ বাল্যবিভাগ হইতে থাকিলেই ভাল হয়। ইহার দুইটি সুবিধা আছে; শিক্ষকের মন্তব্য লেখার জায়গা থাকিল, আর দেখিতেও সুন্দর হইল।

লিখিবার আর দুইটি ধাপ আছে,—শুনিয়া লেখা ও তাড়াতাড়ি লেখা। শ্রুতিলিখনের অভ্যাস বাল্যবিভাগ হইতেই চলিতে পারে; অন্যের কথা বুঝিতে সময় লাগে, কাণ ঠিক

করিতে হয়, কৈশোরবিভাগ হইতে দ্রুত লিখনের অভ্যাস করাইতে হইবে।

লেখার মধ্যে দিয়া সৌন্দর্য শিক্ষার পথ খোলা আছে। শুধু অক্ষরের ছাঁদ নয়, লেখার উপকরণও সাবধান হইয়া ব্যবহার করিতে হইবে। সাধারণ পরিচ্ছন্নতার পরিচয় যেন পাওয়া যায়।

হাতের লেখাতে মানুষের চরিত্র স্পষ্ট আঁকা থাকে, সেই-জন্য হাতের লেখা দেখিয়া লোকের প্রকৃতি অধ্যয়ন করা শাস্ত্রের পর্যায়ে উঠিয়াছে। হাতের লেখা ভাল করিতে পারিলে চরিত্র উন্নত করা যায় না কি?

কি লিখিবে? লেখার ভিতর দিয়া অনেকে নীতিকথা শিখাইবার পক্ষপাতী। Copybook maximsকথাটা আমরা ইংরেজি হইতে গ্রহণ করিয়া বাংলায়ও মানিয়া থাকি। দেশের বড় বড় লোকের নাম, ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানের নাম, বিখ্যাত নদীর নাম নিকটবর্তী গ্রামের নাম ইত্যাদি লেখান মন্দ নহে,—তাহাতে নূতনত্বের আস্বাদ আছে বলিয়া। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লেখার বিষয়বস্তুরও পরিবর্তন হইবে।

অন্যের কথা শুনিয়াই হউক, আর পুস্তক হইতেই হউক, কি নিজের মন হইতেই হউক, যাহা লেখা হইবে তাহা যদি পড়িবার মত হয়, ও দেখিতে সুন্দর হয়,—তাহা হইলে লেখা শিখাইবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

৪

বর্ণপরিচয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রকে পড়িবার বস্তু জোগাইতে হইবে। পড়িতে পড়িতে বর্ণের সঙ্গে পরিচয় হইবে গাঢ়; তাহার পূর্বে বর্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান হইবে, কিন্তু সে জ্ঞানে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা থাকিতে পারে না। তাই বর্ণপরিচয়ের পরে দুইবৎসর যায় বর্ণমালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মাইতে; এবং সেই ঘনিষ্ঠতা অল্প কিছু পড়ার উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক পুস্তকে থাকে শব্দগঠনের পর বাক্য। এই বাক্যের প্রকৃতি এমন হওয়া চাই যেন ছাত্র তাহা বুঝিতে পারে এবং শব্দগুলি তাহার পরিচিত হয়। অনেক সময় প্রথম পাঠের এই দিকটি দেখা হয় না। যেমন,

আঢ্য জন সুখে থাকে।

জাড্য দোষ দূর কর।

য-ফলা শিখাইতে হইবে, সুতরাং বাক্যে য-ফলা যুক্ত শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাও দেখা দরকার। জাড্য বা আঢ্য কথাটা আমরা সচরাচর প্রয়োগ করি না, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? নূতন কথাটি ছাত্রেরা শিখিল তো ঠিক; তবে? সম্ভবতঃ এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়াই কোন লেখক তাঁহার পাঠে ণ-ফলার উদাহরণ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—

ষণ্ণবতি বয়স হল,—কৃষ্ণ চিনলে না?

আমরা কিন্তু প্রাথমিক পাঠে ছাত্রদের পড়িবার অভ্যাস হইল, ইহাই দেখিতে চাই, সেই সঙ্গে যাহা পড়িল তাহা বুঝিতে পারে তাহাও চাই। যে বয়সের ছাত্রদের কথা

বলিতেছি, তাহাদের নিকট প্রত্যেক অজানা শব্দের অর্থ বলিয়া দেওয়া সম্ভব নহে।

একদেশে এক রাজা ছিলেন।
রাজা বড় ভাল লোক ছিলেন।
সবাই রাজাকে বড় ভাল বাসত।
সেই দেশে একজন লোক এল একদিন।
সে বিদেশী লোক।
সে পাখি বেচতে এল।
কত রকমের পাখি নিয়ে এল।
শালিক, ময়না, টিয়ে, হীরামন—আরও কত কি।

ইহাতে গল্পের একটা পৃথক আনন্দ আছে। এই আনন্দ হইতে শিশুদিগকে কেন বঞ্চিত রাখি, তাহার কারণ নাই।

যে গল্পের অর্ধেক উপরে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে যুক্তাক্ষর নাই। এমন গল্পের সংখ্যা বড় কম। সাধারণতঃ যুক্তাক্ষরে গল্প দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এ সব গল্পের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে,—বর্ণমালার সঙ্গে শিশুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় করাইয়া দেওয়া। রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ দ্বিতীয় ভাগে ইহা সুন্দরভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।

"………ঘর বন্ধ যেন না থাকে। সন্ধ্যা হোলে ঘরে ধূনোর গন্ধ দিয়ো। দীনবন্ধুকে রেখো পাশের ঘরেই। তাঁদের সঙ্গে সিন্ধু বাবু আসবেন, তাঁকে অন্য ঘরে রাখতে হবে। …………...সেই অন্ধ গায়ককে ডেকে এনো।"

বর্ণপরিচয়ের প্রত্যেকটি অক্ষর যত বৃহৎ আকারের, প্রথম

পাঠে অক্ষরগুলি তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র করিতে হইবে. অবশ্য সচরাচর বয়স্ক লোকেরা যে অক্ষর দেখিতে অভ্যস্ত, তাহার অপেক্ষা এই ক্ষুদ্র অক্ষরও বড় হইবে। কেহ কেহ প্রথম দুই শ্রেণীর অক্ষর কত বড় করিয়া ছাপা হইবে তাহার সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়া থাকেন, ছেলেরা যেন প্রত্যেক অক্ষরের উপর আঙ্গুল রাখিয়া পড়িতে পারে। বই ধরিতে শিখানোও এই সময় দরকার, একটু আলাদা ও আলগা কাগজ ব্যবহার করিলে বই ময়লা হইবে কম।

এইরূপ পাঠে, একই বর্ণ বারবার দেখিয়া ও পড়িয়া যে লাভ হয়, স্বতন্ত্র কয়েকটি বাক্য পড়িয়া তাহা হয় না। আজ-কাল প্রথম পাঠের প্রায় সমস্তটাই পৃথক পৃথক্ করিয়া গল্পের মত লিখিলে বা পড়াইলে ভাল হয়। শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকে জোড়া তাড়া দিয়া অর্থাৎ পড়াইতে গিয়া কিছু অদলবদল করিয়া, পাঠ ছাত্রদের উপযুক্ত করিয়া লইতে পারেন, তাহাতে মুদ্রিত বর্ণ অপেক্ষা ভাষার শক্তির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে, তাহারা বুঝিবে যে এই শক্তি তাহাদেরও প্রয়োগ করা সম্ভব।

গল্প দিয়া প্রথম পাঠ অভ্যাস করাইলে ভাল বটে ; কিন্তু এক বিপদও আছে। এক দিক হইতে কতকগুলি গল্প দিলে পড়িতে পড়িতে একঘেয়ে না হইয়া যায়। সেই জন্য গল্পের বহর করিতে হইবে ছোট, তাহাতে ছেলেরা দম পাইতে পারিবে, তাহাদের পাঠে বৈচিত্র্যও থাকিবে। আমাদের প্রথমপাঠই যেন আনন্দ দিতে পারে, আরও

পড়িবার ইচ্ছা যেন আমরা পড়ুয়ার মনে জাগাইতে পারি।

নূতন পড়িবার বা পড়িতে পারার আনন্দে ছাত্রেরা পড়িতে চাহিবে, কিন্তু তাহাদের কথা যাহাতে স্পষ্ট হয়, সেজন্যও তাহাদের আনন্দ বাড়াইবার জন্য সকলে মিলিয়া একসঙ্গে দুই চারিটি বাক্য পড়িতে দিতে হইবে। যেমন, 'যার ছেলে যত পায়, তার ছেলে তত চায়।' ইহা উচ্চৈঃস্বরে পড়িলে এবং সকলে মিলিয়া পড়িলে, কোন কথা কতক্ষণ ধরিয়া উচ্চারণ করা যায় তাহার একটা মাত্রাজ্ঞান হইবে। মাঝে মাঝে এই রূপে সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে পড়িবার অভ্যাস করিলে ভাল হয়। যে সব পাঠ পড়িতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নড়িতে চড়িতে হয় বা হাত নাড়িয়া কি ভাবভঙ্গীর দ্বারা অর্থ প্রকাশ করা যায়, এরূপ পাঠ এই সময়ের জন্য নির্বাচন করা উচিত। এই সময়ে বর্ণযোজনার প্রতি ছাত্র লক্ষ্য রাখিবে, কিন্তু যদি পড়ার মধ্যে সে একটা আনন্দ পায়, একত্র দেখিয়া ও দেখাইয়া যদি অর্থ বুঝিতে পারে, তবে তাহার পড়িতে কষ্ট হইবে না।

প্রাথমিক পাঠের সম্বন্ধে একটি বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ না করিয়া পারি না। ইহা দ্রুত পাঠের বিষয় বা বয়স নয়; সুতরাং তাড়াতাড়ি যেন পড়ানো না হয়। তাহা সত্ত্বেও ছাত্রেরা নিশ্চয় মুখস্থ করিয়া ফেলিবে,—পরম উৎসাহে মুখস্থ করিবে; কিন্তু বুঝিয়া মুখস্থ করিতেছে কি না, বাস্তবিক পড়িতে পারে কি না, সে বিষয়ে শিক্ষককে সতর্ক থাকিতে

হইবে। স্পষ্ট উচ্চারণ, অক্ষরের যথার্থ জ্ঞান,—ইহাই প্রাথমিক পাঠের উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে, পরবর্তী পাঠে পদে পদে বাধা জন্মিবে।

বর্ণপরিচয় ও প্রথমপাঠের সময় শিক্ষককে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকিয়া দিতে বা দেখাইতে হইবে। মুদ্রিত পুস্তকে প্রতি পাঠে হয়তো একটি করিয়াই ছবি দেওয়া সম্ভব; কিন্তু পড়াইবার সময় যেন তাহার চেয়ে বেশি ছবি দেওয়া হয়—শিক্ষক আঁকিতে পারিলে তো ভালই, না হইলেও যেন তিনি ছবি জোগাড় করেন এবং ছাত্রদিগকে তাহা দেখাইয়া ভাষার সঙ্গে তাহাদের যোগ স্থাপন করেন। কোনও কোনও পুস্তকে ছবি এবং পাঠের মধ্যে কোনও সম্বন্ধই থাকে না, অভিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট তাহা করুণ ও হাস্যরসের উপাদান মাত্র।

৫

সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকলায় প্রভেদ এই যে, সাহিত্য বর্ণবিন্যাসের উপর, বলিবার বা লিখিবার ভঙ্গীটির উপর উহার উৎকর্ষের জন্য নির্ভর করে, অন্যান্য শিল্পকলার প্রকাশের জন্য নিজ নিজ পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে, যেমন চিত্রশিল্পী বা স্থপতির উৎকর্ষ বর্ণ বা ইষ্টকাদি বিন্যাসের উপর। যদি আমরা সাহিত্য পড়াইতে চাই, তাহা হইলে এই পাঠের বা লেখার ভঙ্গীটি ছাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল কি না, তাহাই প্রথমে দেখা কর্তব্য। গানের যেমন সুর; চিত্রের যেমন রেখা, সাহিত্যের পক্ষে পাঠ তেমনই আবশ্যক। লিখিবার ভঙ্গী তো হইল

পাঠের পরিবর্তে—আমরা যাহা বলি তাহা যাহাতে বহু লোকে জানিতে পারে, বহু লোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে তাহার জন্যই তো লেখা, ছাপান, ইত্যাদি; এসকল চেষ্টা, কিন্তু তাহার পর সাহিত্য পড়িতে হইবে। সাহিত্যের শ্রেণীতে পাঠের এই মর্যাদা দেওয়া যে কতদূর প্রয়োজন তাহা একটু পরীক্ষা করিলেই বুঝা যাইবে।

একবার একজন শিক্ষক আমার কাছে অভিযোগ করেন, রবীন্দ্রনাথের 'মানী' কবিতাটি বিদ্যালয়ে পড়াইবার অনুপযুক্ত, কারণ তাহাতে পড়াইবার কিছু নাই—না বিষয়বস্তু, না আর কিছু। কথাটা আমার তখন বড় অদ্ভুত লাগিয়াছিল; পরে তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলাম, ব্যাপারটা বিষয়বস্তু লইয়া নহে, তিনি উহা পড়িতে পারেন না বলিয়া তাঁহার অভিযোগ। অথচ

সিরোহিপতি সভায় আসে
মাড়োয়ারাজে ল'য়ে সাথ;
উচ্চশির উচ্চে রাখি
সম্মুখে করে আঁখি পাত।
কহিল সবে বজ্রনাদে,
"সেলাম কর বাদ্‌শাজাদে,"—
হেলিয়া যশোবন্ত-কাঁধে
কহিলা ধীরে নরনাথ,—
"গুরুজনের চরণ ছাড়া
করিনে কারে প্রণিপাত॥"

এই চরণ কয়টির ভাবের গাম্ভীর্য, সংযম, সৌন্দর্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও সমস্ত কবিতাটির ছন্দেরই যে নিজস্ব একটা সৌন্দর্য আছে, তাহা ভুলিলে চলে কি করিয়া ? মধুসূদনের কবিতা উপভোগ করিতে হইলে তাহা ভাল করিয়া পড়া চাই —না হইলে সে কবিতার প্রতি সুবিচার হইবে না, তাহাকে ব্যঙ্গ করাই হইবে ! রবীন্দ্রনাথের কবিতা কি অন্য কোনও কবিতা আস্বাদন করিতে বা করাইতে হইলে ছন্দের জ্ঞান না থাকিলে যে একেবারে অসুবিধায় পড়িতে হয়, তাহাতে তো কোন সন্দেহ নাই ।

দুন্দুভি বেজে উঠে ডিম্ ডিম্ রবে,
সাঁওতাল-পল্লীতে উৎসব হবে।
পূর্ণিমা-চন্দ্রের জ্যোৎস্নাধারায়,
সান্ধ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায়।
তালগাছে তালগাছে পল্লবচয়,
চঞ্চল হিল্লোলে কল্লোলময়।

নিম্নশ্রেণীতেও এই ধরণের কবিতার যে আকর্ষণ, তাহা তো সম্পূর্ণভাবে ধ্বনির জন্যই, ছন্দের জন্যই, তাহা কে অস্বীকার করিবে ? এই কবিতার অর্থ তখনও বুঝান যায় না, ইহার সুন্দরচিত্র তখনও অস্ফুটই থাকে, কিন্তু ধ্বনিতরঙ্গের ছন্দ, আরোহ-অবরোহ ক্রম, শব্দের দোলা মনকে অমনই অন্যদিকে লইয়া যায়। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ঝর্ণা' পাঠ্য পুস্তকে স্থান পাওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে অনেক শিক্ষক ও শিক্ষা-

বিদ্ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা আপত্তি করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা এই যে উহার অর্থ বুঝা বড় কঠিন; সর্বত্র অর্থ সুসঙ্গত হয় না, কথার তোড়ে ভাসাইয়া লইয়া যায় বটে, কিন্তু উহা যে শ্রেণীতে পড়ান হয়, সেই শ্রেণীতে উহার শব্দের অর্থ কাহারও আভাসে বুঝিতে পারাও অসম্ভব। এ কথার উত্তরে যদি বলা যায় যে উহা শুধু ছন্দের জন্য, শুধু ধ্বনির জন্যই বটে, তাহাতে তাঁহারা বলেন যে abracadabra দিয়া শিক্ষাদান ভাল নহে,—

Thirty days have September,
April, June and November—

এহেন কবিতার ছন্দ আছে বটে, কিন্তু আর কিছু নাই; 'ঝর্ণা' ইহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, কারণ ইহার অর্থ বুঝিতে গেলে মনের ভিতর গণ্ডগোলই পাকাইয়া যায়, আর কিছু লাভ হয় না।

এই আপত্তির চরম রূপ মানিয়া লইতে পারা যায় না; বিশেষ করিয়া শিশুমন অর্থের জন্য তেমন লালায়িত হয় না, যেমন হয় ধ্বনির জন্য আগ্রহান্বিত। ধ্বনির চমৎকারিতায় বিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন কে না মুগ্ধ হইতে চাহে? এরূপ কবিতার অর্থে যদি কোথাও বাস্তবিকই সুসঙ্গতির অভাব থাকে তবে জিজ্ঞাসা জাগিবার পূর্বে, অর্থাৎ নিম্নতর শ্রেণীতেই তো ইহার পাটনা ভাল। রবীন্দ্রনাথ এসম্পর্কে এক জায়গায় বলিয়াছেন,

"কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ নয়

শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে—মনের মধ্যে ঘা দেওয়া। সেই আঘাতে ভিতরে যে জিনিসটা বাজিয়া উঠে যদি কোন বালককে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে বলা হয় তবে সে যাহা বলিবে সেটা নিতান্ত একটা ছেলেমানুষী কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশী; যাঁহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া কেবল পরীক্ষার দ্বারাই সকল ফল নির্ণয় করিতে চান তাঁহারা এই জিনিষটার কোনও খবর রাখেন না। আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিষ বুঝি নাই কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব একটা সাড়া দিয়াছে।" (জীবনস্মৃতি)

আমাদের সাহিত্য শিক্ষার ভার যাহাদের উপরে ন্যস্ত তাঁহারা সকলেই জানেন, আমাদের উপর যে আনন্দ পরিবেশনের ভার সেই আনন্দ আমরা প্রায়ই দিতে পারি না। অথচ ছন্দ হইতে যে আনন্দ জন্মে, ভাল পাঠ করার যে আনন্দ তাহা দিতে আমরা কেন যত্ন করিব না? আমাদের হাতের কাছে যে সকল উপায় আছে তাহার সবগুলিই জানিতে হইবে ও প্রয়োজনমত প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে সাহিত্যশিক্ষা আবার প্রীতিকর হইয়া উঠিতে পারে, ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই আনন্দ লাভের ব্যবস্থা হয়।

যাঁহারা ইংরেজি পড়ান, তাঁহারা এবিষয়ে অনেক সাবধান, অনেক বেশি মনোযোগ দিয়া থাকেন। ইংরেজি উচ্চারণ যাহাতে স্পষ্ট হয়, যতিনির্দেশ যাহাতে প্রথম হইতেই ছেলেরা মানিয়া চলে, যতটুকু থামিবার ততটুকু থামে, যেখানে জোর দিবার সেখানে জোর দেয়, সে সকল দিকে শিক্ষক নিজজ্ঞান-

মত সজাগ থাকেন, এবং ব্যতিক্রম দেখিলে তাহা সংশোধন করার চেষ্টাও করেন। বাংলা পড়াইতে গিয়া কিন্তু সাধারণতঃ এই প্রকার যত্ন লওয়া হয় না ; তাহার জন্য দায়ী কে ?

ছাত্রদিগের মধ্যে ভাল পড়ার জন্য উৎসাহ দিতে হইবে। কি গদ্যে, কি পদ্যে, ভাল করিয়া পড়া চাই। উচ্চারণ স্পষ্ট হওয়া চাই। বিকৃত উচ্চারণের জন্য আমরা চিরকাল উপ-হাসের পাত্র হইয়াছি। পূর্বদেশনিবাসীদের আশীর্বাদও লইতে আর্যাবর্তের লোকে ভয় করিত, কি জানি, যদি 'শতায়ুর্ভব' বলিতে 'হতায়ুর্ভব' হইয়া যায়, আশীর্বাদ যদি অভিসম্পাতে দাঁড়ায়। একালে বহু শিক্ষক ভাল উচ্চারণ করিতে পারেন না। শুচিবাতিকগ্রস্ত অধ্যক্ষেরা অবশ্য ইংরেজি শিক্ষকের জন্য পশ্চিম বাংলার লোকই পছন্দ করেন, পূর্ববঙ্গের লোককে নয় ; তাঁহারা ভুলিয়া যান যে ভুল উচ্চারণে উভয়েই সমতুল্য, এবিষয়ে পূর্বপশ্চিমের ভেদ লোপ পাইয়াছে। শিক্ষকের উচ্চারণ, শিক্ষকের পাঠ, শুনিয়া তবে তো ছাত্র শিখিবে। ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষকের অনুকরণপ্রীতি থাকা স্বাভাবিক, শিক্ষকের বিকৃত উচ্চারণও তাহারা যেমন নকল করিয়া কৌতুক অনুভব করে, যথার্থ উচ্চারণও তাহারা তেমন আগ্রহে মনে রাখিয়া দেয়। সেইজন্য শিক্ষককে পড়ার দিকে ভারি সাবধান হইয়া চলিতে হয়, যেদিন যেটুকু পড়াই-বেন, তাহা পূর্ব হইতে যত্নের সহিত পড়িয়া আসিবেন, না হইলে পড়ার ভুলত্রুটির জন্য অর্থ বুঝিতেও গোল বাধে। দেবেন্দ্রনাথের 'মা' কবিতায় প্রথম কথাটির উপর জোর না

দিলে সমস্তই যে ব্যর্থ! রবীন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত 'মানী' কবিতায় 'গুরুজনের' কথাটিতে গুরু'র উপর জোর দিতে হইবে। পড়া এমন করিয়া হওয়া উচিত যে অর্থ তাহাতেই, শুধু পড়িলেই, সুস্পষ্ট ও সুন্দর হইয়া দেখা দেয়।

শ্রেণী অনুসারে পড়ার তারতম্য হইবে কি, হইলে কতখানি হইবে, এই প্রশ্ন সহজেই আসে। এখানেও শিক্ষকের বিবেচনার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। ভুল সংশোধনের অবসর পাইলে ভুল সংশোধন করিতেই হইবে, 'নাত্র কালবিচারণা'। নীচের শ্রেণীতে যে পড়িতেছে, হয়তো তাহার উচ্চারণ উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের অপেক্ষা ভাল। গৃহ, পরিবেশ, বংশ, এমন কি জাতি অনুসারেও উচ্চারণের পার্থক্য হইতে পারে, ও হইয়া থাকে; তথাপি এ পার্থক্য দূর করা যায়, উচ্চারণের বাধা অনতিক্রমণীয় নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত লেখক চার্লস ল্যাম্ব নিজের কথা রহস্য করিয়া বলিতেন, তাঁহার ছিল slight impediment in speech—কথা বলিতে সামান্য একটু অসুবিধা হইত; অর্থাৎ তিনি ছিলেন তোত্‌লা। কিন্তু চেষ্টায় ও অভ্যাসে তোত্‌লামিও সারে। জিহ্বার জড়তা, চেষ্টার ফলে খানিকটা কাটিয়া যায়। ছাত্রেরা যখন বুঝিতে পারিবে যে শিক্ষক পড়ায় উন্নতি চাহেন এবং ভাল করিয়া পড়িতে পারা অসম্ভব তো নহেই, বরং আনন্দদায়ক,—যে ভাল করিয়া পড়ে তাহারও পড়িতে ভাল লাগে,—তখন তাহারা অবশ্যই ভাল করিয়া পড়িতে চেষ্টা করিবে ও তাহাদের সে চেষ্টা সফল হইবে।

নীচের শ্রেণীতে এজন্য শিক্ষক মোটামুটি অধিক সময় ব্যয় করিতে পারেন, এবং তাঁহার কাজও সহজ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রহণ করিবার ক্ষমতাও যে কমিয়া যায়! যতিস্থানে নীচের শ্রেণীতে যতখানি থামিতে হইবে, উপরের শ্রেণীতে ততখানি নহে। নীচের শ্রেণীতে সমবেত পাঠেরও খানিকটা চেষ্টা করা যায়, তবে তাহার ফল বৈচিত্র্য ও কৌতুক, এবং শিক্ষককে আরও সজাগ থাকিতে হয় যে দলের মধ্যে কেহ ফাঁকি না দেয়, বেসুরা না বলে।

প্রাচীনকালের কথাটিকে আমরা পুনরায় স্মরণ করিয়া বলিতে পারি,—আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী। বোধবিহীন আবৃত্তি আবৃত্তিই নয়।

বিদ্যালয়ের নিত্যকার পাঠ, আবৃত্তি ও অভিনয়, এই তিনটিতে প্রভেদ আছে যথেষ্ট; সেই প্রভেদ একটু বিবৃত করা প্রয়োজন। নিত্যকার পাঠে আড়ম্বর, কি অন্যকে দেখাইবার কোনও চেষ্টা, নাই; আবৃত্তি কিন্তু অন্য দশজনকে শোনাইবার জন্যও বটে; আর অভিনয়ে কথার সহিত অঙ্গভঙ্গীও অল্পবিস্তর থাকে, কোথাও একটু চোখের চাহনি, কোথাও বা একটু হাসি, কোথাও গ্রীবার বলনি, এসমস্ত থাকিতে পারে। বিদ্যালয়ের সাহিত্যপাঠে এই লক্ষণগুলি যেন উৎকট না হইয়া পড়ে, তাহা অবশ্য দেখিতে হইবে, তিনটিরই ঢং আছে, কিন্তু প্রত্যেকটির ঢংই তাহার নিজস্ব।

৬

সাহিত্য পড়াইতে গিয়া শিক্ষককে ছন্দের বিষয় কিছু জানিতে হইবে, বাংলা কবিতা পড়িতে গেলে বাংলা ছন্দের ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে ছন্দ যে পড়াইতে হইবে, তাহা নহে, তবে কবিতা ছন্দের অনুসারে পড়িতে ও পড়াইতে হইবে। ছাত্রের পক্ষে বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জনের কোনও প্রয়োজন নাই, কিন্তু শিক্ষকের পক্ষে যথেষ্ট আছে।

আমাদের ভাষা কেন, আচরণের মধ্যেও ছন্দ থাকার কথা। তাই সাধারণতঃ আমরা শুনি, 'ও লোকটা বেতালা বলিতেছে, উহার কথা বেসুরা ঠেকিল;' এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পড়ি—

সঞ্চার কর সকল কর্মে
শান্ত তোমার ছন্দ।

আমাদের উচ্চারণের মধ্যে যদি ছন্দ আনিতে পারি, কবিদের কাব্যকথায় সাহিত্যিকের রচনায় যে ছন্দ আছে তাহা যদি ধরিতে পারি, তবে সেই ছন্দ আমাদের আচরণেও সঞ্চারিত বা প্রকাশিত হইবে, ইহা গৌণ হইলেও মহৎফল। ইংরেজ শিক্ষাবিদ্‌গণ এই প্রকারের ছন্দকে balance বলিয়া গিয়াছেন। ছন্দের এই বিশেষ অর্থের কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্যের লেখার

মধ্যে যে ছন্দ আছে তাহা যদি ধরিতে না পারি, তাহা হইলে তাঁহাদের লেখা তো পড়াই হইল না, তাঁহাদের বক্তব্যও বুঝা গেল না। এই দিক দিয়াই আমরা বর্তমানে বাংলা ছন্দের কথা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ছন্দের অবশ্য আর এক দিক আছে, গানের সুরের মত ছন্দেরও একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, অর্থবিযুক্ত ভাব-স্বরূপ স্বাতন্ত্র্য, যাহার কথা কবি ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন—

> মানবের জীর্ণবাক্যে ছন্দ মোরে দিবে নব সুর,
> অর্থের বন্ধন হ'তে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
> ভাবের স্বাধীন লোকে— (কাহিনী, ভাষা ও ছন্দ)

ছন্দের সেই দিকের কথা আমরা কিন্তু এখানে আলোচনা করিব না। ছন্দের কথা বুঝাইতে হইলে তুলনায় বলা হইয়া থাকে—পেণ্ডুলামের দোলন, ঢেউয়ের যাওয়া-আসা, গানের তানে উঁচু-নীচু নামার ক্রম, আকাশের রং এর পরিবর্তন। ভাষার ছন্দ উহাদের মতই স্পন্দনের সৃষ্টি করে; তবে ভাষায় স্পন্দনের সৃষ্টি হয় মানসিক আবেগের অনুযায়ী।

কিন্তু ভাষায় ভাষায় উচ্চারণগত পার্থক্য যখন আছে, তখন ছন্দোবন্ধনের পার্থক্যও থাকিবে। সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারণ অনুসারে ব্যতিক্রমের স্থান নাই, বৈচিত্র্যের অভাব কানেও লাগে না।

কশ্চিৎকান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ—

হইতে আরম্ভ করিয়া মেঘদূত ঐ যে ছুটিল, শেষ পর্যন্ত তাহার একটানা গতিতে কোথাও আবর্তের সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু

ইংরেজি ভাষায় মাঝে মাঝে কবিতাকে একটু পা-টা বদলাইয়া চলিতে হয় :—

Tell me not in mournful numbers
Life is but an empty dream,
For the soul is dead that slumbers,
And things are not what they seem,

বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণরীতি সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করে না। সংস্কৃত ছন্দ ইহাতে প্রবর্তিত করার চেষ্টা হইয়াছিল, —কখনও যত্নের সহিত, কখনও কৌতুকে। যেমন, কৌতুকে

যস্য গৃহে টাকা নাস্তি হা টাকা টক্‌টকায়তে ;

আবার

ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥

কিন্তু আমাদের হ্রস্বদীর্ঘ ও সংস্কৃতের হ্রস্বদীর্ঘ সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা 'বীণাপাণি'র 'বী' লিখি ঈকার, কিন্তু উচ্চারণ করি 'বি' ; সুতরাং সংস্কৃতের সহিত আমাদের প্রভেদ থাকিবেই।

আমাদের দেশে যাঁহারা ছন্দ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত বলিয়াছেন। লিখিত অক্ষরে সংখ্যা গণিয়া রচনা মিলাইবার প্রথা হইতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উৎপত্তি হয়। ইহাতে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব স্পষ্ট ; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কথা মনে পড়ে, যাঁহারা চৌদ্দ অক্ষর গণিয়া পয়ার কবিতা রচনা করিতেন। আশা করা যায়, তাঁহাদের যুগ চলিয়া গিয়াছে।

ছন্দে বর্ণ-উচ্চারণের কাল-পরিমাণকে পরিমিত করিয়া দেয়। উচ্চারণের এই কাল-পরিমাণের নাম মাত্রা। স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনযুক্ত স্বরবর্ণ যদি হ্রস্বভাবে উচ্চারণ করা হয় তাহা হইলে একমাত্রা হয়; দীর্ঘ উচ্চারণ করিলে, কিংবা ব্যঞ্জনান্ত স্বর যদি শব্দের অন্তে থাকে তাহা হইলে, দুই মাত্রা। সংযুক্ত বর্ণের পূর্বস্বর গুরু, সুতরাং দুই মাত্রা; তৎসমশব্দের দীর্ঘস্বরও দুই মাত্রা হইতে পারে।

মাত্রাবৃত্ত যদি আমাদের কবিতার ছন্দের মূল হয়, তবে মাত্রা দিয়া অর্থাৎ মাপিয়া দেখিতে হইবে ছন্দ রক্ষা হইয়াছে কিনা। এ যেন ফুট্-রুলার দিয়া মাপিয়া জুখিয়া দেখার চেষ্টা। মাত্রার সংখ্যা অনুসারে কবিতার ছন্দ বিভিন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এখানেও বাংলায় গণ্ডগোল; সংস্কৃতে অক্ষরের মাত্রা সুনির্দিষ্ট, বাংলায় তেমন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই।

স্বরবৃত্ত অনুসারে ছন্দ নির্ভর করে স্বরেরই উপর, আমাদের প্রয়োজনানুসারে, আমাদের উচ্চারণবিধি লঙ্ঘন না করিয়া কবিতাকে ছন্দযুক্ত করিয়া পড়িতে বা লিখিতে পারি। সুর-প্রবণতা ইহারই আছে। প্রত্যেকটি পর্ব নির্ভর করে ধ্বনি বা স্বরের অর্থাৎ syllableএর সংখ্যার উপর।

আকাশ জুড়ে আলোর খেলা—

এখানে 'আকাশ' ও 'আলোর' উভয়তঃই 'আ' ও 'ও' এই দুই স্বরকে টানিয়া দীর্ঘ করা হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু এমনটি করা যাইতে পারিত না, ইংরেজিতে উচ্চারণের টানা-টানি অবশ্য কিছুটা চলে।

এখন কথা উঠিতে পারে, এই তিনটি বিধি অনুসারেই কি বাংলা ছন্দের রূপ নির্দিষ্ট হয়? কেহ কেহ বলেন যে তিনটিই ঠিক নয়, উহার মধ্যে একটিই ঠিক; অক্ষরবৃত্ত বৃত্তই নয়, মাত্রাবৃত্তই ঠিক, স্বরবৃত্তের একটা জায়গা মাত্রাবৃত্তের মধ্যে রাখা যায়; কেহ বা বলেন, সংস্কৃত অর্থাৎ তৎসমশব্দপ্রধান কবিতার প্রকৃতি হইল মাত্রাবৃত্ত, তদ্ভবশব্দপ্রধান ও দেশজশব্দ-মিশ্রিত ভাষা যেখানে বহুল পরিমাণে আছে, সেরূপ কবিতার প্রকৃতি হইল স্বরবৃত্ত। আবার এমনও কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা এই সকল ভাগের মধ্যে ঐতিহাসিক একটা ক্রম দেখিতে পান; কেহ কেহ এমনও বলেন, এক রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই এই তিনটির স্ফুরণ পর পর হইয়াছে, "মানসী"র ভুল-ভাঙা' সর্বপ্রথম মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতা, আর "ছবি ও গান" স্বরবৃত্ত ছন্দ প্রবর্তনের প্রথম প্রয়াস।

ছন্দবিষয়ে আমাদের লেখকদের মধ্যে এই জাতীয় প্রশ্ন লইয়াই কথার কাটাকাটি চলিয়াছে বেশি। কিন্তু ছন্দ লইয়া অন্য দিকের কথা এখন আলোচনা করা যাক।

সকলেই মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষরের প্রভেদ জানেন। যেখানে চরণের শেষে ধ্বনিসাম্য আছে, তাহা মিত্রাক্ষর, অন্যথা অমিত্রাক্ষর।

বারেক এখনও কিরে দেখিবি না চাহিয়া?

হেমচন্দ্রের এই কবিতার প্রথম ও চতুর্থ চরণের শেষধ্বনি এক প্রকার। ইহা মিত্রাক্ষর।

লড়ে গিয়া ব্রেজিলেতে, পড়ে গিয়া জাপানে,
মার্গে সে গোলা দাগে, চড়ে উড়ো ঝাঁপানে।

এখানে পর পর চরণে মিল আছে, ইহা মিত্রাক্ষর।

বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন মধুসূদন। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনার ইতিহাস ব্যাপক ভাবে বা সবিস্তার বিবৃত করিবার স্থান আমাদের নাই। তথাপি প্রায় একশত বৎসর হইতে চলিল, অমিত্রাক্ষর ছন্দের সম্পূর্ণ অর্থ আমরা এখনও গ্রহণ করি নাই। ইহার যতিস্থান অনিয়মিত, শুধু ভাব নয়, ছন্দের দিক দিয়াও অনিয়মিত যতির প্রয়োজন আছে। সুতরাং পড়িবার সময়ে এদিকে অবহিত হইতে হইবে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটা প্রবহমানতাও আছে, যাহাকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'লাইন-ডিঙোনো চাল,' যাহাকে ইংরেজিতে সংক্ষেপে run-on বলিয়া পরিচয় দেওয়া চলে।

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে ; এই জীবনের সকল সাদা কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা ; সেই যে আমার আপন মানুষগুলি
নিজের প্রাণের স্রোতের পরে আমার প্রাণের ঝরণা নিলো তুলি

ইত্যাদি (পূরবী)

এখন চরণের শেষে ধ্বনিসাম্য থাকিলেও ('আলো' 'কালো' ; 'মানুষগুলি' 'নিলো তুলি') প্রবহমানতার জন্য সে সাম্য ধ্বনিত হইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ বলেন,—

ছন্দের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে সমগ্রের মাত্রাসংখ্যা, তার কলা-সংখ্যা ও কলাগুলির মাত্রাসংখ্যা জানা আবশ্যক। ...যেখানে ছন্দের রূপকল্প একাধিক পদের দ্বারা সম্পূর্ণ হয় সেখানে পদসংখ্যাও বিচার্য।

(ছন্দ—১১৪পৃঃ)

কেহ কেহ বলিতে চাহেন, যতিস্থাপন বিধি ও পর্বগঠন প্রণালী ছন্দের মূল কথা। ছন্দোবদ্ধ পদের অংশের নাম পর্ব। ইংরেজিতে accent যেমন ´ এই চিহ্ন দিয়া বুঝান যায়, হ্রস্ব ও দীর্ঘ যেমন বিশেষ বক্র ও ঋজু রেখা দিয়া নির্দিষ্ট হয়, বাংলায়ও পব তেমন চিহ্ন দিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। তবে বাংলায় হ্রস্বদীর্ঘ সংস্কৃত হইতে অন্যভাবে নিরূপিত হয়, এবং যাহা একবার হ্রস্ব হইয়াছে তাহা স্থান-মাহাত্ম্যে দীর্ঘ বলিয়া গণ্য হইতেও পারে। কোনও ছন্দোবিৎ দেখাইয়াছেন,—

॥ ।
প ঞ্চ নদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে—

আবার— । ।
প ঞ্চ কোশ জুড়ি কৈলা নগরী নির্মাণ—

এই দুই চরণে 'পঞ্চের' তারতম্য হইয়াছে। পর্বের সংখ্যা অনুসারে করিতার ছন্দের যে পার্থক্য হয়, তাহা দেখাইবার জন্য দৃষ্টান্ত দিতেছি।

যন্ত্র জাঁতায় / পরাণ কাঁদায়,......দুই পর্ব
ফিরি ধনের / গোলোক ধাঁধায়,......ঐ
শূন্যতারে / সাজাই নানা / সাজে।...অপূর্ণ ত্রিপর্ব

চারিটি পর্ব আছে, কিন্তু চতুর্থ পর্বটি পূর্ণ নহে, যথা—

আপাতত / এই আনন্দে / গর্বে বেড়াই / নেচে,
কালিদাস তো / নামেই আছেন / আমি আছি / বেঁচে।

পাঁচ পর্বের দৃষ্টান্ত—

দুঃখের / বরষায় / চক্ষের / জল যেই / নামল—

কয়েকটি মাত্রা লইয়া এক একটি পর্ব ; কয়মাত্রার পর্ব, সেই অনুসারেও ছন্দের নামকরণ করা যাইতে পারে।

কিন্তু গদ্য ছন্দ ? রবীন্দ্রনাথ নিজে যাহার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহার পক্ষে যুক্তি কি ? আমরা পদ্যের ছন্দকে সুস্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করি, প্রকাশ করি, কিন্তু গদ্যের ছন্দ তত সহজে প্রকাশ হইবার নহে, তত স্থূল নহে, গদ্যের স্বাভাবিক ছন্দ স্থূল, কিন্তু তাহার কাব্যরূপও একটা আছে, গদ্যের সেইরূপে একটা সূক্ষ্ম অথচ স্বাভাবিক ছন্দ আসিয়া পড়ে, তাহা নষ্ট না করিয়া, তাহা ধরিয়া রাখিয়া কবি পাঠকের জন্য তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার 'বাংলা-কাব্যপরিচয়' এর (১৩৪৫) সঙ্কলনের ভূমিকায় কবি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতির কাব্য দেখা দিয়াছে। এটাকে অনধিকার প্রবেশ ব'লে রুখে দাঁড়াবার কোনো আইন নেই। যেমনি প্রাণের রাজ্যে তেমনি সাহিত্য ও কলাসৃষ্টিতে টিঁকে থাকার দ্বারাই তার অধিকার সপ্রমাণ হয়—পুরাতন ও নূতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা নয়, অভ্যাস দিয়ে ঘেরা স্বাদবোধের দ্বারাও নয়। অমিতাক্ষর চন্দ যেমন তার

যতিভাগের অমিতি এবং মিলের অভাব সত্ত্বেও কাব্যের পংক্তিতে চলে গেছে গদ্যকাব্যও যে তেমন চলবে না কারো মুখের কথায় তার স্থির সিদ্ধান্ত হবে না। চিরাচরিত মিতাক্ষররীতির বহু দূর বাইরে গেছে অমিতাক্ষর, আরো বাইরে পদক্ষেপে যে তার চির নিষেধ, অন্তঃপুরচারিণী কবিতা অন্দর থেকে সদরে এলেই যে সে হবে স্বধর্মচ্যুত, সাহিত্যের ঐতিহাসিক নজীর দেখলে বোঝা যায় এ কথা আজ যাঁরা বলছেন হয়তো কাল তাঁরা বলবেন না। বস্তুত নৈবচ বলবার শেষ অধিকার তাঁদের নেই, হয়তো আছে কালকের লোকের।

ছন্দ বিষয়ে কয়েকটি কথা মাত্র এখানে বলা হইল; বিষয় নির্দেশ করা হইল, বুঝান হইল না। ছন্দের পরিচয় কানে শুনিয়াই করিতে হয়, বই পড়িয়া নয়; তথাপি ছন্দ সম্বন্ধে প্রথম শিক্ষার্থীর উপযুক্ত কোনও পুস্তক অনুমোদন করিতে না পারিলেও নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধাদি এ বিষয়ে আলোচনা-প্রয়াসীকে সাহায্য করিবে :—

রবীন্দ্রনাথ.............ছন্দ
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়...বাংলাছন্দের মূলসূত্র
দিলীপকুমার রায়.........ছান্দসিকী
প্রবোধচন্দ্র সেন.........ছন্দোবিশ্লেষণ
(প্রবাসী, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৩৮)

৭

গল্প শুনিতে কে না ভালবাসে ? শিশুর চিত্ত জয় করিতে হইলে গল্প দিয়াই আরম্ভ করিতে হয়। আদর্শ বুঝাইতে হইলে অনেক বড় বড় নীতি কথা দিয়া কেহ কেহ আরম্ভ করেন বটে, তাহাতে কুলায় না—লোকের মনে থাকে না। গল্প কিন্তু মনের মধ্যে দাগ কাটিয়া যায়। হিতোপদেশ-পঞ্চতন্ত্রের লেখক পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা তাহা খুব ভাল করিয়া জানিতেন, তাই তাঁহার গ্রন্থের পদ্ধতি বুঝাইতে গিয়া এই বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন—"কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে।"

আমরা যাহা কিছু পড়াই তাহা সবই যদি গল্পের আকারে বলিতে পারিতাম, তবে কি সুন্দর হইত ! সব সময় কিন্তু গল্প বলা সহজ নয়, গল্প বলাও হয়তো ভাল নয়, কারণ গল্প ছাড়া অন্য কিছু দিতে পারার ক্ষমতাও আমরা ছাত্রদের মধ্যে দেখিতে চাই। আর আমরা কি ছাই ভাল করিয়া গল্প বলিতেই পারি ? কেহ কেহ স্বভাবতঃ ভাল করিয়া গুছাইয়া গল্প বলিতে পারেন। তাঁহাদের জন্য কোনও নিয়ম করার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা পারেন না, তাঁহাদের বিবেচনার জন্য কতকগুলি কথা বলা হইতেছে।

গল্প বলিতে গিয়া খেয়াল রাখিতে হইবে যে তাহা যেন

সুদীর্ঘ না হয়। আমরা অনেক সময় খেই হারাইয়া ফেলি। গল্পের দৈর্ঘ্য শিশুকে বিমনা করিয়া তুলে। গান গাহিয়া মনোরঞ্জন করিতে হইলে যেমন থামিতে জানা চাই, গল্পের বেলাও তেমনই। যখনই অল্পবয়স্ক শ্রোতৃবর্গ উস্‌খুস্ করিতেছে দেখিতে পাইব, তখনই সাবধান হইব, কোথায় কি গলদ ঘটিয়াছে ; গলদের মধ্যে একটি হইল দৈর্ঘ্য। শিশুমনের দম কম, ওজন রাখিয়া গল্প করিলে তাহা আর মাঠে মারা যাইবে না। কলের মত গল্প চলিয়াছে অবিরাম ধারে, তাহা শুনিতে তাহাদের আপত্তি অবশ্য নাই, এবং গল্প ছোট হইলে বরং তাহাদের আপত্তি, তবু মনের উপর একটা ছায়া পাত করিতে হইলে গল্পের আকার অত্যন্ত দীর্ঘ যেন না হয়।

গল্প যেন সহজবোধ্য হয়। কেহ কেহ শুনিয়াছি কোথায় কাহাকে সরসভাবে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে তাহাও ব্যাখ্যা করিতে ছাড়েন না ; রস তাহাতে থাকে কি না, সে খেয়াল নাই। গল্পের সম্বন্ধেও তাই ; যদি তাহার সহজ অর্থ না থাকে, যদি তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতে হয়, তবে তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা সরস হয় নাই, যাহাদের সামনে বলা হইয়াছে, তাহাদের চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। গল্প বলিতে বলিতে এমন যেন না হয় যে তরুণ শ্রোতা ভাবিত হইয়া পড়ে, কোথায় কি ঘটিল তাহা সহজে বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্নাকুল নেত্রে শিক্ষকের পানে চাহিয়া থাকে। গল্পের ভাগগুলি যদি স্পষ্ট হয়, এবং প্রত্যেকটি ভাগ যদি সহজে মনকে স্পর্শ করে, তবে গল্প বলার কিছু মানে হয়।

গল্প বলিতে গিয়া স্থান কালের জ্ঞান থাকা চাই; অবশ্য এমন গল্পও আছে যাহাতে স্থান-কালের কোনও বিবরণ দেওয়ার কথা নাই। 'একতাই শক্তি' বুঝাইতে গিয়া যদি পিতা ও পুত্রগণের লাঠি ভাঙ্গার গল্প বলি, তবে বুড়ার বাড়ি কোথায়, সে কোন সময়কার লোক, এসব কথা না বলিলেও চলিবে; বলিলে ছবি অবশ্য আরও স্পষ্ট হইবে। কিন্তু বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের ঘুড়ি ওড়ানো, কি নেপোলিয়নের ছেলেবেলায় পড়াশুনায় অনুরাগ, কি বুদ্ধদেবের তপস্যা, কি কন্‌ফুশিয়সের হিতোপদেশ বা সাধনার গল্প বলিতে হইলে, যাঁহাদের কথা বলা হইতেছে, তাঁহারা কোন দেশের ও কোন সময়কার লোক, তাহা জানিতে পারিলে লোকের সুবিধাই হইবে; তরুণ শ্রোতার জ্ঞান স্পষ্ট হইবে, এবং শিক্ষকের পক্ষেও পটভূমি স্পষ্ট হইলে গল্পও স্পষ্ট হইবে। এজন্য যদি মানচিত্রের সাহায্য লইতে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই।

আমরা যে গল্প বলিতে পারি না, তাহার এক প্রধান কারণ হইতেছে যে গল্প আমাদের মনের কাছে জীবন্ত নয়। আমরা যাহা বলি, তাহার ছায়া আমাদের মনের পটে পড়ে না। সুতরাং গল্প বলিতে গিয়া ভুলিয়া যাই, গোলমাল করিয়া ফেলি। এইভাবে রসভঙ্গ করিলে ভালোর চেয়ে মন্দ হয় বেশি। যে শোনে, তাহার মনে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তাহার বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে যে ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করিবার কোও পথ আমাদের নাই। গল্প

বলিতে শেখার সময় অবশ্য এরূপ ত্রুটি সহনীয়, আমাদের মধ্যে ভাল গল্প বলিতে পারে এমন লোক কম, কিন্তু গল্পকে নিজের কাছে জীবন্ত ছবি করিয়া তবে গল্প বলিতে হইবে।

গল্প বলিবার সময় কথার মারপ্যাঁচের উপর জোর না দিয়া বিষয়বস্তুর উপর জোর দেওয়া ভাল। আমরা যদি বেশি কবিত্ব করিতে যাই, তাহা হইলে বিপদ ঘটিতে পারে, অর্থাৎ খেই হারাইয়া যাইতে পারে। ঘটনার খেই যদি ভাল করিয়া ধরা থাকে, তবে কোনও ভয় নাই, তখন অবশ্য যাঁহারা পারেন, তাঁহারা কথার তুবড়ী ছুটাইতে থাকুন। শিশু বা কিশোর কিন্তু কথার সেই সৌন্দর্য সব সময় বুঝিতে পারিবে না ; যতটা সময় হাতে থাকে, তাহা তো কাহার ভাগ্যে কি দশা হইল অর্থাৎ ঘটনার স্রোত কোন দিকে বহিতেছে তাহা বুঝিতেই কাটিয়া যাইবে। তাই বলিয়াছি, যিনি গল্প করিবেন, তিনিও যদি বিষয়বস্তুর উপর জোর দিতে থাকেন, তবে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে মিল বা সাম্য স্থাপিত হইবে, শক্তির অযথা ক্ষয় হইবে না।

তাই বলিয়া বিষয়বস্তু অর্থে শুধু ঘটনা বুঝিতে বলিতেছি না, বক্তা ভাবও ফুটাইয়া তুলিবেন। যেখানে যে ভাব ফোটানো দরকার তাহা না ফুটাইলে গল্পের মোহিনী শক্তি থাকিবে না। কথার মারপ্যাঁচ না জনিয়াও ভাব ফোটানা যাইতে পারে। শ্রোতার মনে করুণভাব জাগাইতে হইলে একটু দীর্ঘনিঃশ্বাসেও কাজ হয়, বেশি কথা প্রয়োগ সেখানে শুধু ব্যর্থ নয়, উদ্‌ভ্রান্তিজনকও বটে।

গল্প বলিয়াই শিক্ষকের কাজ শেষ হইল না। তাঁহাকে গল্প আবশ্যকমত বুঝাইয়া দিতে হইবে, এবং ছাত্রদের দিয়া লিখাইয়া লইতেও হইবে। বলা, বোঝানো, লেখানো,—হয়তো লেখানোর আগে বলানো প্রয়োজন। যাঁহারা শিক্ষকতা কার্যে অভিজ্ঞ, তাঁহারা জানেন, তাঁহারা একটি গল্প এক ভাবের দিক হইতে বলিলেন, ছাত্র বুঝিল অন্যরকম! ইহা অনবরত হইতেছে। শরৎবাবুর 'মহেশ' গল্পটি হইতে কত অনর্থই না বাহির হইয়াছে ঃ—হিন্দু জমিদারের মুসলমান প্রজাকে নিপীড়ন, সমাজতন্ত্রবাদের গল্পাকারে বিবৃতি, ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' পড়িয়া একাধিক ছাত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, কবি তামাক খাইতে ভালবাসিতেন! সুতরাং একবার ছাত্রকে দিয়া, কতটুকু সে বুঝিল তাহা জানিবার জন্যও ঐ গল্পটি বলাইয়া লওয়া উচিত। হয়তো শিক্ষককে একাধিকবার গল্পটি বলিতে হইবে—তাহার পর জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে হইবে যে, তাহারা সমস্ত কথা বুঝিয়াছে কি না।

তাহার পর লেখানোর কাজ। সংক্ষেপে লিখাইতে গেলে দুই একজনকে ডাকিয়া ব্ল্যাক বোর্ডের উপর লিখাইতে আরম্ভ করা, ও পরে সকলকে দিয়া তাহার বিচার, ও সর্বশেষে সমস্তটা নিজের নিজের খাতায় লিখিতে দেওয়া মন্দ নহে।

শিক্ষক যে গল্প বলিলেন, ছাত্রেরা কেহ তাহার অনুরূপ গল্প বলিতে পারে কি না, তাহাও দেখা চাই। বিশেষ করিয়া শিশু শ্রেণীতে অনেক সময় এরূপ ছেলে পাওয়া যাইবেই যে

ঐরূপ গল্প বলিতে রাজি। তাহাতে পড়ানোর কাজ সহজ হইবে। শিক্ষককে এ বিষয়ে উৎসাহ দিতে হইবে। যদি ছাত্রেরা সঙ্কোচ বোধ করে, প্রয়োজনমত শিক্ষক সেরূপ অন্য গল্প পড়িয়া শোনাইতেও পারেন।

গল্প বলিবার সময় দুইটি বারণ মানিয়া চলিতে হয়। এক কোনও এক অংশের উপর যেন বেশি জোর দেওয়া না হয়; দ্বিতীয়, গল্প সরস হউক, কিন্তু উত্তেজক না হয়; শিক্ষায় সংযমও প্রয়োজন, সুতরাং কথায় ও গল্পে তাহা রক্ষা করিয়া ও রক্ষা করিতে সাহায্য করিয়া, শিক্ষক শিক্ষা দিতে থাকিবেন।

শিক্ষক তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে যদি গল্প বলেন, তবে সব চেয়ে সহজ হয়। যাহা নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে ঘটিয়াছে তাহা ভুলিবার কথা নয়; তাহা ছাড়া, নিজের অভিজ্ঞতা বলিতে সকলেরই আগ্রহ আছে। তাহার একটা স্পষ্ট ছবি আমাদের মানসপটে আঁকা থাকে। এই কারণে প্রথম প্রথম নিজের অভিজ্ঞতার কথা গল্প করিলে গল্প বলা সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া আসে।

একটি বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত। গল্প বলিবার সময় 'নীতিশিক্ষা দিতেছি' এই ভাব বর্জন করিতে হইবে। কেহ কেহ (এমন কি প্রসিদ্ধ গল্পকারেরাও) গল্প বলিয়া উপদেশটি ব্যাখ্যা করিয়া জুড়িয়া দিবার লোভ ছাড়িতে পারেন না; ইহাতে সমস্ত সরসতা দূর হইয়া গল্প কটু হইয়া পড়ে। "এই গল্প হইতে কি শিক্ষা পাইলাম?" তাহা না হয় উহ্যই থাকিল: সমস্ত সরস পানীয় নিমেষে তিক্ত হইয়া উঠিবে, যদি উপদেশের ভারে গল্পের শেষটুকু ভারি হইয়া উঠে।

কবিতা পড়াইবার একটা সুবিধা আছে। ইহার ছন্দ স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করে। শিশুও অভিনয় দেখিতে গিয়া গানের দুই একটি চরণ বাড়ীতে আসিয়া আবৃত্তি করে, অথবা দুই একটা চটকদার কথা মনে রাখে ; তাহার অর্থ হয়তো সে বুঝে না, তবু তাহাতে কি আসিয়া যায়! কিন্তু গদ্য পড়ানো, গদ্যকে সরস করিয়া তোলা, গদ্যে ছাত্রদের কৌতূহল জন্মানো, এক কঠিন ব্যাপার। গদ্যেরও ছন্দ আছে, তবে ছন্দের পরিচয় দিতে তাহা ব্যগ্র নহে। তাই, তুলনা করিলে মনে হয়, পদ্য পড়ানো অপেক্ষা গদ্য পড়ানো কঠিন। এক প্রকার গদ্যের কথা বলিয়াছি, গল্পের কথা ; এখন, যে সকল রচনা শুধু প্রকৃতি কি মানুষের কীর্ত্তি বর্ণনা করিয়া গিয়াছে, তাহাদের কি করিয়া সরস করা যায়, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতেছি। 'সূর্যের আকার', 'মাতাপিতার প্রতি ভক্তি', 'পরিচ্ছন্নতা'— এই সকল গদ্য রচনা, উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের তৃতীয় হইতে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাহাদের সম্বন্ধে কোনও আলোচনা এখানে করিব না ; বৈজ্ঞানিক বা নৈতিক বিষয়ের একটা স্বতন্ত্র আকর্ষণ আছে, বিষয়ের উপস্থাপন দ্বারা বা গল্প বলিয়াও সেই আকর্ষণ সম্ভব হয়।

গদ্য ও পদ্যের ক্ষেত্র মোটামুটি স্বতন্ত্র বলিয়া ধরা হয়,—গদ্যের ক্ষেত্র জ্ঞান, পদ্যের ক্ষেত্র সৌন্দর্যবোধ বা রসানুভূতি। আমাদের বিদ্যালয়ে যেসকল গদ্য রচনা পড়ানো হয়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির উদ্দেশ্য থাকে জগতের নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের ধারণা পরিষ্কার ভাবে জান্মানো; 'সূর্যের আকার' বা 'ভাতের জন্মকথা' তাহাদের পর্যায়ভুক্ত। এখন বাংলা ভাষা শিক্ষার বাহন হওয়ায় ও বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অবশ্যপাঠ্য হইবে আশা করায়, এরূপ গদ্য রচনা আর বেশিকাল সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তকে স্থান পাইবে না বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

নীতিশিক্ষা যাহার উদ্দেশ্য, এমন পাঠের সম্বন্ধে জনৈক অভিজ্ঞ শিক্ষক কি বলিয়াছেন, তাহা তাঁহারই ভাষায় উদ্ধৃত করিয়া দিইঃ—

We must present the poem for the poem's sake, the play for the play's sake, the essay for the essay's sake, none of them as learning or as information, but all of them as beauty, truth and joy. A mother teaching her child her nursery rhymes is nearer to the heart of creative literature than the teacher arresting the appeal of beauty while he explains allusions or elucidates obscurities. The lecture instructing the future teacher and the teacher instructing the youthful pupil must both be faithful to the spirit of their undertaking.

গদ্যের বর্ণনা হইলেও, কবিতার দুই একটু অংশ দিয়া আরম্ভ করিলে ভাল হয়। বাংলার কোনও গ্রাম, কি বাংলা দেশের পরিচয় সম্বন্ধে পাঠ আরম্ভ করিতে হইবে। যদি বাংলার সম্বন্ধে কোনও কবিতা বা গান দিয়া (অবশ্য গাহিয়া নয়, আবৃত্তি করিয়া) শিক্ষক পাঠ আরম্ভ করেন,তবে সুফল হইবার সম্ভাবনা অধিক। যেমন, বাংলা দেশের কথাতেই—

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদে বঙ্গে—

ইত্যাদি। ইহাতে ছাত্রছাত্রীদের মন পাঠ্য বিষয়ে অমনই আকৃষ্ট হইবে ও পাঠে সংহতি জন্মিবে। পাঠারম্ভের পক্ষে ইহা কম অনুকূল নহে। হিমালয়ের বর্ণনায় যদি আমরা বিহারীলালের, কি রবীন্দ্রনাথের, কি সমুদ্র-বর্ণনায় 'এষা'র কবি অক্ষয় বড়ালের, কবিতা হইতে ছাত্রদের উপযোগী বুঝিয়া কিছু কিছু পড়িয়া শোনাই,—আবৃত্তি করিতে পারিলে আরও ভাল,—তবে ছাত্রদের মন তাহাতে আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। সর্বদা প্রথমেই এরূপ কবিতা আওড়াইতে হইবে, তাহা নহে. আরম্ভ করিয়া কিছু পরে আওড়াইলেও কাজ চলিতে পারে।

অনেক সময় বর্ণনা বুঝাইতে গিয়া ছবি দেখাইলে কাজ হয়। এখানে ছবি অর্থে সেই সব ছবির কথা বলিতেছি,—যাহা বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকেই পাওয়া যায়। আমাদের বিদ্যালয়-গুলির সাধ্য অল্প, তাহাদের সবাক-চিত্র বা অবাক-চিত্র

দেখাইতে বলা বিড়ম্বনা ; কিন্তু সুদৃশ্য চিত্র, এমন কি ফটো-গ্রাফিক চিত্র, সংগ্রহ করা ভিন্ন কথা, তাহা সহজসাধ্য। হিমালয়, পুরী, সমুদ্র এসকলের বর্ণনা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ যদি তাহাদের সুদৃশ্য চিত্র সম্মুখে দেখিতে পাইত, তবে তাহাদের কল্পনাশক্তিও সতেজ হইয়া উঠিত। বয়স্কদের কল্পনা করিবার ক্ষমতা অধিক হওয়া উচিত, সুতরাং তাহাদের জন্য তেমন চেষ্টা না করিলেও, নীচের দিকে এবিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষকগণ সহজে অবহিত হইতে পারেন।

শিক্ষক নিজে যদি খড়ি দিয়া ব্ল্যাক বোর্ডে আঁকিতে পারেন, তাহা হইলে তো কথাই নাই। শিক্ষকদের আঁকিতে জানা একটা মস্ত গুণ। আজকালকার দিনেও আমরা সচরাচর ব্ল্যাক বোর্ড ব্যবহার করিতে জানি না বা চাই না। শিক্ষা একটু সরস করিতে হইলে খড়ির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। আমাদের দেশে ইহাকে ভাল করিয়া আমল দিতে হইবে। ইংরেজিতে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে chalk and talk প্রণালী। এখন আর সেকেলে চা-খড়ি দেখি না, দেখি চক্-এর সুদশ্য পেন্‌সিল। ছাত্র ও শিক্ষক উভয়কেই ইহার বহুল প্রয়োগ শিখিতে ও করিতে হইবে।

বর্ণনার সময়ে মানচিত্র কখনও কখনও কাজে লাগিতে পারে। তিব্বতের কথা, কিম্বা ভারতবর্ষের কোন তীর্থস্থান (যেমন বারাণসী বা অযোধ্যা, দ্বারকা বা কাঞ্চী), কি নীল-নদের বর্ণনা পডাইবার সময়ে মানচিত্র কাজে লাগে বই কি।

তবে মানচিত্রেই আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। তাজমহলের বর্ণনায় আগ্রার কথা আসিবে, এবং মানচিত্রে আগ্রার স্থান নির্ধারণ করিলে তাজমহলের বর্ণনা ফুটিবে বেশি; কিন্তু তাজমহলের ছবি বা 'মডেল' দেখাইতে পারিলে আরও ভাল; দুইটির সংযোগের তো কথাই নাই।

এতক্ষণ চিত্র, মানচিত্র, ব্ল্যাক বোর্ড ও খড়ির কথা বলা হইতেছিল,—উহারা হইল material aids to education; কিন্তু ইহা ভিন্ন আর একটি উপায় আছে। আগ্রা কি দিল্লী, সাহারা কি সাগর, হিমালয় কি মক্কা, কাহারও বর্ণনা পড়াইতে গেলে প্রসঙ্গক্রমে বা প্রসঙ্গের আরম্ভে কোনও ভ্রমণ বৃত্তান্তের সাহায্য লইলে ভাল হয়, শুধু কবির কল্পনা নহে, প্রত্যক্ষদর্শীর বৃত্তান্তও বটে। তাহাতে সাধারণ পাঠকের অথবা ছাত্রের জ্ঞানের উৎকর্ষ হইবে, যেটুকু ধারণা জন্মিবে তাহা হইবে স্পষ্ট এবং স্পষ্ট বলিয়াই সুন্দর ও সংযত।

বিদ্যালয়ে পড়াইবার সময় আমরা সর্বদাই কবির চোখে দেখিতে পারি না, আমরা তখন মুহূর্তের আহ্বানে কল্পনাপ্রবণ হইতে পারি না; আর সেজন্য আমাদিগকে দোষও দেওয়া যায় না। কিন্তু যদি একেবারেই চেষ্টা না করি, তাহা হইলে ছাত্র তো পাঠ্যবিষয়কে আরও নীরস বোধ করিবে। আচার্য জগদীশচন্দ্রের 'ভাগীরথীর উৎসসন্ধানে' কি 'জগতের শেষ কোথায়?' ম্যাট্রিক শ্রেণী বা অষ্টম মানের উপযুক্ত পাঠ্য; কিন্তু ইহাদের উদার পরিকল্পনার সঙ্গে নিজের কল্পনার যোগ-সূত্র স্থাপন না করিয়া ইহাদের কিছুই বুঝিতে পারা যাইবে

না। অনুভূতির খানিকটা গাঢ়তা না থাকিলে, কল্পনার প্রসার কতকটা না জন্মিলে, এরূপ বর্ণনা ভাল করিয়া পড়ানো যায় না ; বুঝিতেও পারা যায় না। তাই এইরূপ রচনা অষ্টম মানের পূর্বে দেওয়া ঠিক নহে। শিক্ষকদের এরূপ রচনা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইতে হয়। অল্প পূর্বে যে ইংরেজ শিক্ষকের উপদেশ উদ্ধৃত করিয়াছি তাঁহারই অনুবৃত্তি করিয়া বলি,—

Teachers must enjoy before they can communicate enjoyment; they must believe before they can convince, and be ardent in order to ignite. They must have faith, both for themselves and for their 'pupils. They must remember that literature is not a vehicle of information or an academic pursuit. For most people in most schools literature is the chief means by which the developing soul is made mindful of its divine nature.

আমাদের মত অরসিকের হাতে পড়িয়া ভাল ভাল লেখকের অবস্থা তেমনই হইতে পারে, যাহার কথা ভারতচন্দ্র অনেক পূর্বে বলিয়া গিয়াছেন,—

পড়িয়া ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।

তাই আমাদিগকেও মুহূর্তের জন্য কবি হইতে হইবে, উপরে বর্ণিত উপায়গুলি অবলম্বন করিয়া দেখিতে হইবে যাহাতে ছাত্রদেরও গদ্যে ভাল বর্ণনা ভাল লাগিতে পারে।

৯

এ পর্য্যন্ত আমরা বর্ণপরিচয়, প্রথম পাঠ, কবিতা কি করিয়া পড়িতে হয়, গল্প কি করিয়া জমাইতে পারা যায় ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিয়াছি। অনেকেই মনে করিবেন, পড়ানোর আসল কথা তো হওয়া উচিত মানে বলা ; যতক্ষণ শুধু পড়ার উপরই জোর দেওয়া হইল, কি মুখে মুখে গল্প বলা হইল, ততক্ষণ দরকারি কাজ করা হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহা পড়িতেছি তাহার অর্থ যদি না বুঝিলাম, তবে সে পড়ার লাভ হইল কি। 'রবীন্দ্রনাথের স্পর্শমণি' পড়াইতে আরম্ভ করিলাম ; এ সংক্রান্ত যাহা যাহা জ্ঞাতব্য তাহা পূর্বে পরিষ্কার করিয়া লইলাম ; জিজ্ঞাসা করিলাম, 'চৈতন্য কে ছিলেন ?' 'বৈষ্ণব কাহাকে বলে ?' 'সনাতনের বিষয় কি জান ?' কিন্তু তাহার পর ? অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করি কখন ?

যে পুস্তক সরকারী অনুমোদন লাভ করিয়া বিদ্যালয়ে পড়ানো হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে নির্দ্দেশ দেখিতে পাই : "কবিতাপাঠের পূর্বে কবিতাশীর্ষস্থ শব্দগুলির অর্থ বোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে।" "প্রত্যেক প্রবন্ধ পড়াইবার পূর্বে প্রবন্ধের শীর্ষস্থ শব্দগুলির অর্থ আলোচনা করিয়া বোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে।" অভিজ্ঞ শিক্ষকের পাঠটীকা দেখিলাম : 'শিক্ষক ছাত্রগণকে মনে মনে কবিতাটি পাঠ করিয়া কঠিন

শব্দগুলি বাছিয়া লইতে বলিবেন।" সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না ; ইহাই কি উত্তম কল্প ?

শব্দবিষয়ে জ্ঞান বাড়াইতে হইবে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু নূতন শব্দের পরিমাণ কোনও একটি পাঠের তুলনায় বেশি না হয়। দুরূহ শব্দ ছাত্রদিগকে শিখাইতে হইবে বই কি ; কিন্তু প্রথমেই তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া বা বলিয়া দিয়া নহে। ছাত্র নূতন শব্দ দেখিতে পাইলে তাহার অর্থ ধরিতে চেষ্টা করুক ; শিক্ষক মহাশয় বলিয়া দিবেন, কি অভিধানে পাওয়া যাইবে, এই নিশ্চিন্ততার মধ্যে না থাকিয়া সে চেষ্টা করুক, কেমন করিয়া শব্দটির অর্থ ধরিতে পারা যায়। পাঠের মধ্যে শব্দ স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়া থাকে না। দশটি জানা শব্দের সঙ্গে একটি অজানা শব্দ মিশিয়া থাকিলে তাহার অর্থ বাহির করা খুব কঠিন নাও হইতে পারে। অনুমান করিবার শক্তি আমাদের খানিকটা আছে ; সেই শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমরা নূতন নূতন শব্দের অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা করিতে পারি। কৃত্তদ্ধিতাদি দ্বারা শব্দসকল সিদ্ধ হয় ; সুতরাং প্রত্যয়ের জ্ঞানও এ বিষয়ে কাজে লাগিতে পারে। চেষ্টা করিয়াও যখন ছাত্র নূতন শব্দের অর্থ ধরিতে পারিতেছে না দেখা যাইবে, তখন বলিয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। পল্লীগ্রামের লোক নিরক্ষর হইয়াও গভীর ভাবের বিষয়বস্তু ও কঠিন কঠিন শব্দরাজির একটা অর্থ বুঝিয়া লয় ; তাহারা অর্থের সন্ধানে ঘোরে, সুতরাং শব্দের জালে আটকাইয়া যায় না।

এই বাক্যটি আছে কোনও গল্পের মধ্যে ; পূর্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া যদি ইহার অর্থ করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলেও একটু ভাবিতে হইবে। কোনও কঠিন শব্দ ইহাতে নাই ; তথাপি ইহা নীচের শ্রেণীতে পড়ানো যায় না। কোন্ শ্রেণীতে পড়ানো চলে ?

নীরব দ্বন্দ্বের গোপন আঘাত প্রতিঘাত প্রকাশ্য বিবাদের অপেক্ষা অনেক বেশী দুঃসহ।

আমার মতে ইহাও চতুর্থ শ্রেণীর নীচে কোনও মতেই পড়ানো উচিত নহে। কিন্তু পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকেও ইহা দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে। এইরূপ বাক্যেরই ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের 'দান-প্রতিদান' গল্প বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী তিনটিতে পড়াইবার জন্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। গল্পের শেষ 'প্যারা'টিতে কঠিন শব্দ নাই, কিন্তু ভাব গ্রহণ করা কঠিন ; তাহার জন্য বুদ্ধি ও কল্পনার সাহায্য লইতে হয়।

শশিভূষণ উত্তর দিতে পারিলেন না—তখন তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়াছে—রাধার মুখের দিকে অনিমেষ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া একবার দক্ষিণ হস্ত তুলিলেন। তাহাতে কি বুঝাইল বলিতে পারি না। বোধ করি রাধা-মুকুন্দ বুঝিয়া থাকিবে।

ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সমগ্রের অর্থ পরিস্ফুট করাই প্রধান প্রয়োজন। যদি সমগ্রের ধারণা জন্মে, তবে কোথাও এক আধটি শব্দ না জানিলেও কিছু আসে যায় না। আমরা এদিকে মন দিলে, ছাত্রের উপর ব্যাখ্যা করার ভার মোটামুটি

ফেলিয়া দিলে, দেখিতে পাইব যে একাজে তাহারা সহজেই অগ্রসর হইতে পারিবে। Whitehead সাহেব এক জায়গায় বলিয়া গিয়াছে,—Imagination is a contagious disease—কল্পনা ছোঁয়াচে রোগের মত; একজন যদি কিছু কল্পনার পরিচয় দেয় তবে তাহার দেখাদেখি অন্য ছাত্রেরাও কল্পনার সাহায্য লইতে চেষ্টা করিবে। সোক্রাটিস তো সবই শিখাইতেন, নিজে কিছু বলিয়া দিতেন না; তাঁহার প্রণালী ছিল উৎকৃষ্ট। বাস্তবিক পক্ষে, আমরা পাঠ্যবস্তুর বিষয়টি ছাত্রেরা মোটামুটি চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিল, ইহাই দেখিতে চাই; thoughtful understanding of the sense is the true start.

এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটে ইহার বিপরীত। শিক্ষক মহাশয় ছাত্রকে কঠিন কথা দেখিলেই অর্থ বলিয়া দিতে অগ্রসর হন। ফলে ছাত্রের স্বাবলম্বনে জন্মে অপ্রবৃত্তি। কারণ তাহার নিজের উপর নির্ভরতা নাই। সে শিখিয়াছে শিক্ষকের উপর নির্ভর করিতে,—আর তাহার মন বিশ্লেষণমুখী হওয়ায় সমগ্রের উপলব্ধি সে করিতে পারে না। পাঠের মধ্যে কঠিন শব্দের জন্য তাহারও মন আকুল হইয়া উঠে। কিন্তু শিক্ষা-নীতির অন্যতম মূলসূত্র হইল, খণ্ডের ধারণা অপেক্ষা সমগ্রের ধারণা অধিক প্রয়োজনীয়।

যাহারা পিছনে পড়িয়া আছে এরূপ ছাত্রদের জন্য অবশ্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা চাই। তাহাদের হয়তো আরও সহজ পাঠ্য-পুস্তকের দরকার, তাহারা যে সকল ধাপ পার হইয়া গিয়াছে,

তাহার বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান জন্মে নাই, ধারণা স্পষ্ট হয় নাই। সুতরাং তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র বিধান চাই।

একথা অবশ্য মানিতে হইবে যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে পাঠ্যবস্তু দুরূহ শব্দের উপর এরূপভাবে নির্ভর করে যে তাহার ধারণা না হইলে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারা যায় না। কঠিন শব্দের অর্থ সেখানে অবশ্যই বলিয়া দিতে হইবে। উপরের সাধারণ সূত্র সেখানে খাটিবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কোনও কোনও কবিতার উল্লেখ করা যায়। অষ্টম মান অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তককে কবিকঙ্কণের 'ফুল্লরার বারমাস্যা' পাঠ্য। তাহার মধ্যে কোনও কোনও স্থানে শব্দের অর্থ প্রথমে বলিয়া দিতে হইবে, কল্পনা করিয়া তাহা পাওয়া যাইবে না। যেমন,—

দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ॥

অথবা

আঁধারে লুকায় মৃগ, না পায় আখেটী॥

তথাপি এই কথা মনে রাখা উচিত,

আগাগোড়া সমস্ত বুঝিতে পারাই সকলের চেয়ে পরম লাভ নহে।

রবীন্দ্রনাথ (জীবনস্মৃতি)

১০

আমাদের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে প্রশ্নের স্থান সামান্য নহে। শিশুচিত্তের একটা চৌহদ্দি লওয়া সাধ্যমত প্রয়োজন। ছাত্রদের জ্ঞান কতখানি আছে, যে জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া পড়াইব? পাঠ আরম্ভের সময় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা জানিয়া লইতে হয়। ইহার নাম দেওয়া যাইতে পারে, 'আরম্ভিক' প্রশ্ন। 'বিদ্যাসাগরের কথা' পড়াইবার সময়ে সাগরের অর্থ জিজ্ঞাসা করা, বিদ্যাসাগর কথাটার অর্থ জিজ্ঞাসা করা এই পর্যায়ে পড়িবে। আবার যাহা জানা আছে, তাহা হইতে নূতন বিষয়ে লইয়া যাওয়ার সময়ে এমন প্রশ্ন করিতে হয় যাহাতে সহজে বিষয়ান্তরে প্রবেশ করিতে পারা যায়; ইহাকে 'সন্ধানী প্রশ্ন' নাম দিতে পারি। আবার পড়ানো শেষ হওয়ার সময়ে ছাত্র কতখানি গ্রহণ করিয়াছে তাহা দেখার জন্য প্রশ্ন। এইরূপে আমাদের পাঠদানের আদ্যে, মধ্যে ও অন্তে সর্বত্র প্রশ্নের স্থান।

এমন অনেক শিক্ষক আছেন, যাঁহারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ছাত্রদিগকে ব্যতিব্যস্ত করেন। শিক্ষকের প্রশ্নের জাল এড়াইবার জন্য কত ছাত্র পাঠগৃহের চৌকাঠ মাড়াইতে চাহে না। "যেথায় অস্ত্রের লেখা, ব্যথাও তথায়!" কথায় বলে,

"খোঁড়ার পা খানায় পড়ে।" যাহারা ভাল করিয়া পড়িয়া আসে নাই, তাহাদেরই কি যত দুর্দশা, শিক্ষক তাহাদের কথাই কি ভাল করিয়া জানেন! কাহারও ভাগ্যে এমনও ঘটিয়াছে যে ছাত্র সরাসরি জবাব দিয়াছে, নিতান্ত অসহায় হইয়া বলিয়াছে—Sir, why do you ask me, I do not know anything!

কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের অর্থাৎ শিক্ষকদের ইহা ব্রহ্মাস্ত্র, সহজে ছাড়িয়া দিতেও পারি না। হিন্দুশাস্ত্র বরাবরই আরম্ভে বলিয়া আসিয়াছে,—অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা, ইত্যাদি; জিজ্ঞাসা না থাকিলে, জানিবার ইচ্ছা না জন্মিলে, প্রশ্ন না করিলে, উত্তর দিবার সার্থকতা কি? আমরা অবশ্য উল্‌টা করি, আমরাই প্রশ্ন করি, ছাত্রদের নিকট হইতে আশা করি উত্তর আসিবে। কিন্তু তাহা সর্বদা আসে না। একটা পুরাতন নীতিবাক্য বলি; নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াৎ —জিজ্ঞাসা না করিলে কাহাকেও বলিবে না। বড় ভাল কথা; পিপাসা না জাগিলে জলদান ব্যর্থ হইবে; শিক্ষাগ্রহণের তাগিদের অভাবে আমাদের অকাতরে বিদ্যাদান নষ্ট হইয়া যাইতেছে।' রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; তিনি একদিন ছাত্রদের সম্মুখে এই সনাতন প্রথারই ইঙ্গিত করেন, বলেন যে, কেহ কিছু প্রশ্ন করিলে তবে তিনি তাহার উত্তর দিবেন। গুরু-শিষ্য সংবাদে শিষ্যই প্রশ্ন করে প্রথমে, তবে গুরু উপদেশ দেন। গীতায় ত্রিবিধ ভক্তের কথা আছে,—আর্ত, জিজ্ঞাসু,

আর্থার্থী ; তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন জিজ্ঞাসু। জিজ্ঞাসায় প্রশ্নের মূল্য যে কত, তাহা আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই : প্রশ্নই তো সেখানে সব।

ছাত্র জিজ্ঞাসা করিবে, গুরু বা শিক্ষক করিবেন উত্তর,ইহা অবশ্য উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু যতক্ষণ তাহা না হয়, ততক্ষণ ছাত্রের আপত্তি সত্ত্বেও প্রশ্ন যে করিতেই হইবে। অবশ্য ছাত্রকে দিয়া প্রশ্ন করাইয়া লইতে হইবে, ছাত্র যেন মনে মনে বোধ করে যে সে নিজেই প্রশ্ন করিতেছে ; ইহা উত্তম কল্প। এখনকার বিদ্যা-দানে ছাত্রদের মধ্যে কে প্রাজ্ঞ আর কে জড়,তাহা যে জানিতে হয়, এইখানেই বিদ্যার পরীক্ষা। আর যতক্ষণ পরীক্ষা না হইতেছে, ততক্ষণ আমরা কিছুতেই আমাদের শিক্ষা সফল হইল কি না তাহা বলিতে পারি না। আমাদের পাণ্ডিত্য ছাত্রদের 'মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল', তাহারা কিছুতেই কিছু ধরিতে পারিল না, এতটা আমরা কেহই চাই না। সেই জন্য প্রশ্ন করার দায় এড়ানো অসম্ভব, প্রশ্ন করিতেই হইবে।

কিন্তু প্রশ্নবিদ্যার সঙ্গে আমাদের তেমন পরিচয় নাই। আমরা যে ভাবে প্রশ্ন করি তাহাতে অনেক সময় বোধ-শক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ না করিয়া তাহাকে প্রতিহত করে ; পিপাসা না জাগাইয়া জলে বীতরাগ করিয়া তোলে। সুতরাং প্রশ্নের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। আমাদের প্রশ্ন করিবার ধারা কিরূপ, তাহার কিছু আভাষ নীচে দেওয়া হইতেছে।

প্রথমতঃ, আমরা শব্দ লইয়াই বেশি নাড়াচাড়া করিয়া থাকি। কোনও শব্দের প্রতিশব্দ ও তাহার অর্থ ; পদ্যে শব্দের

কিরূপ বিকার হয় (যেমন, 'মূর্তি' স্থানে 'মূরতি'—'আজি কি তোমার মধুর মূরতি' ইত্যাদি); বিপরীতার্থবোধক শব্দ (যেমন 'উষ্ণ' ও শীতল', 'লঘু' ও 'গুরু'); বাক্যাংশের অর্থজ্ঞাপক একটি শব্দ ('জানিবার ইচ্ছা' স্থলে 'জিজ্ঞাসা'); বর্ণাশুদ্ধি (এজন্য সময় সময় শিক্ষকের নিজের ত্রুটি যে দায়ী নয়, তাহা বলা যায় না) ইত্যাদিতেই আমাদের আগ্রহ। শব্দ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান থাকা, শব্দসম্পদ বাড়ানো, খুবই ভাল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রশ্ন করিবার সময়ে শিক্ষকেরা যদি শব্দের গণ্ডী ছাড়াইয়া না যান, তবে তাহাও কঠিন কথা।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের বৈয়াকরণিক প্রশ্ন ছাত্রদিগকে সময় সময় উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে। 'আভাষ' না 'আভাস', কোন্‌টা ঠিক? ষত্বণত্ব জ্ঞান না থাকিলে মানুষই হয় না, এ কথা সে-কালের পণ্ডিতেরা (একালেরও যে নয়, তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না) মনে প্রাণে খুবই বিশ্বাস করিতেন। সন্ধি-বিচ্ছেদ করা, পদনির্ণয় করা, শব্দের ব্যুৎপত্তি বাহির করা; 'হিরণ্ময়', 'সার্বজনীন' প্রভৃতি শব্দে তদ্ধিতপ্রত্যয় কোন্ অর্থে হইয়াছে; 'উপাধ্যায়', 'আচার্য', 'মাতুল' প্রভৃতি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কিরূপ হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করা:—এ সকল বড় ভীতিকর প্রশ্ন। অনেক ছাত্রের সাহিত্যপিপাসু মন এই সব প্রশ্নের দেওয়ালে ঘা খাইয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে।

তৃতীয়তঃ, আমাদের প্রশ্নের মধ্যে কখনও কখনও সরাসরি নৈতিক চরিত্র ভাল করিবার চেষ্টা দেখা যায়। 'উপরে যাহা

পড়িলে তাহা হইতে কি উপদেশ পাওয়া যায় ?' কি 'এই পাঠে কি শিক্ষা হয়'—এই ধরণের প্রশ্নে মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে, ছাত্রও মানুষ ; কি শিক্ষা পাওয়া যায় বা কি উপদেশ লেখক দিতে চাহেন, সে বিষয়ে চট করিয়া উত্তর করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে পাঠ্যবস্তুর রসবোধের দিকে না তাকাইলেও চলে।

ইংরেজিতে এক ধরণের প্রশ্ন করার রীতি আছে, আমরা ছেলেবেলা হইতে তাহাকে critical question বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু কেন বলি তাহার কোনও কারণ নির্দেশ করিতে পারি না। ইহাতে যাহা পড়া হইল তাহার তত্ত্বের দিক্, বিষয়বস্তুর দিক্ হইতে জিজ্ঞাসা করা হয়। যেমন, পঞ্চম শ্রেণীতে 'চরিত্র' বিষয়ে এক প্রবন্ধ পড়ান হইয়াছে ; প্রশ্ন হইল চরিত্র বলিতে তোমরা কি বুঝ ? কি করিয়া চরিত্র লাভ করিতে হয় ? উত্তর অবশ্য প্রবন্ধের মধ্যেই দেওয়া আছে। ছাত্র শুধু সেই উত্তর কণ্ঠস্থ করিয়া গড় গড় করিয়া বলিবে। অথবা, 'পারিব না' নামে একটি কবিতা পড়ানো হইয়াছে ; তাহার পর প্রশ্ন করা হইয়াছে, কোনও কাজ একবার না পারিলে কি করা উচিত তাহা নিজের কথায় বর্ণনা কর।'

আমাদের সাধারণজ্ঞান যে বড় অল্প, তাহা বুঝিতে পারিয়া আমরা আর এক ধরণের প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করি। যেনন, পৌরাণিক গল্প পড়াইয়া আমরা পুরাণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করি ; কবি সাদীর কথার প্রসঙ্গে নোশেরওয়ান বা সাসানীবংশ সম্বন্ধে, শেরশাহের কথা বলিতে গিয়া কলিঞ্জরের সম্বন্ধে। পাঠ্যপুস্তকে

গুছাইয়া বলিতে পারি কি না দেখিতে হইবে। ধরা যাক্, পল্লীর শোভা ও শান্তি বর্ণনা করিতে হইবে; লেখক যেমন সুন্দর করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, পাঠক বা ছাত্রকেও তেমন ভাবে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যদি এই বর্ণনা খানিকটা সুন্দর না হয়, তবে পাঠ লওয়া বা দেওয়া ঠিক হয় নাই। তৃতীয়তঃ, আজকাল প্রত্যেক সাহিত্যপাঠেই কিছু কিছু আদর্শ প্রশ্ন দেওয়া হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে যে, পুস্তকে প্রদত্ত প্রশ্ন আদর্শমাত্র, তাহার সঙ্কেতে শিক্ষককে নূতন প্রশ্ন প্রস্তুত করিতে হইবে।

১১

আমাদের বিদ্যালয়ে যে সকল পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হইয়া থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে অভিযোগের অন্ত নাই। ছাপা, ছবি ও কাগজ সম্বন্ধে মোঠামুটি উন্নতি হইয়াছে, এ কথা সত্য; কিন্তু পুস্তকের দোষগুণ বিচারের কথা তো স্বতন্ত্র। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনী সমিতির নির্দেশ সকলকে মানিতে হইবে,নতুবা পুস্তক পাঠ্যরূপে অনুমোদিত হইবে না; এবং অনুমোদন না পাইলে প্রচার ও অর্থাগম, কোনও দিকেই সুবিধা নাই। যাঁহারা পুস্তক লিখেন বা প্রকাশ করেন, তাঁহারা সকলেই অবশ্যপ্রচার বা অর্থাগমের আকাঙ্ক্ষা করেন। সুতরাং নির্বাচনী সমিতির নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়। তথাপি পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে আমাদের পছন্দ না করিবার মত এত অধিক জিনিষ আছে যে,

অনেকে মাঝে মাঝে বলিয়া উঠেন, পাঠ্যপুস্তক বলিয়া কোনও কিছু নির্দেশ করিয়া কাজ নাই, পাঠ্যপুস্তক উঠাইয়া দেও।

কিন্তু কথাটা কি ঠিক? পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত করিয়া দিলে তাহার কিছু কিছু সুফলও পাওয়া যায়। প্রথমতঃ পাঠ্যপুস্তক হইল মানদণ্ড, তাহার তৌলে ওজন করিয়া আমরা বুঝিতে পারি, কোন্ শ্রেণীতে কতদূর পড়ানো হইয়াছে, কতখানি শেখানো হইয়াছে। মুদ্রিত পুস্তকের বিষয়ে বা পক্ষে বলিবার কথাও কিছু আছে; উহা দেখিয়া এক নিশ্বাসে বুঝিতে পারা যায়, ক্লাসে কতখানি পড়া হইয়াছে। মানদণ্ড হিসাবে পাঠ্যপুস্তককে গ্রহণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পাট্যপুস্তক শিক্ষকেরও একটা অবলম্বন। তিনি যাহাই শিখান, যাহাই বলুন, পাঠ্যপুস্তকের উপর ভিত্তি করিয়া যদি বলেন, মোটামুটি পাঠ্যপুস্তক পড়িয়া যদি তাঁহার কথার অনেকটা বুঝিতে পারা যায়, তবে তাহাও তো পাঠ্যপুস্তকের একটা সার্থকতা।

তৃতীয়তঃ, পাঠ্যপুস্তকনির্বাচনী সমিতির অনুমোদন পাওয়ার জন্য লেখকের একটু সাবধান হইয়াই লিখিতে হয়; সুতরাং এরূপে লিখিত পুস্তকের একটা গুণ আছে—তাহা সযত্নে রচিত হয়; খুব ভাল না হউক, খুব খারাপও হইতে পারে না, অর্থাৎ ইহার অপকর্ষের একটা সীমা আছে। এই ত্রিবিধ কারণের জন্য আমরা পাঠ্যপুস্তকের অপ্রশংসা করিতে পারি না।

কিন্তু পুস্তকপাঠে উদ্দেশ্যের কতটুকু সহায়তা হয়? প্রথম কথা হইল, নির্বাচনী সমিতির অনুমোদিত সকল পুস্তকই

সাধারণভাবে ভাল, কিন্তু তাই বলিয়া কোনও পুস্তক কোনও বিশেষ স্থান বা বিশেষ শ্রেণীর উপযোগী না-ও হইতে পারে। The teacher shall select methods and books suitable for his own speical problem. প্রত্যেক শিক্ষকেরই পাঠ্যপুস্তকের কিছু অদল বদল করিয়া লওয়া প্রয়োজন, কারণ তাঁহার ছাত্রদের যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহা তো ছিল লেখকের অজ্ঞাত; লেখক অবশ্য সকলের জন্য সাধারণভাবে লিখিয়া গিয়াছেন, হইতে পারে সাধারণসূত্র হিসাবে তাহা অনবদ্য, কিন্তু তাহা কাজে লাগাইতে গেলে প্রতি পদে কিছু কিছু পরিবর্তন করিতে হইবে বই কি।

দ্বিতীয় কথা,—পুস্তক স্বভাবতঃ সীমাবদ্ধ হওয়ায় কাহারও কাহারও নিকট বিরাগভাজন। 'এতগুলি বিষয় ইহাতে নাই', 'অমুক কবিতাটি নাই'—'আহা! অত ভাল কবিতা বাদ গিয়াছে!' 'আচ্ছা, এই প্রবন্ধটি সমস্ত দেওয়ার কি দরকার ছিল? খানিক দিয়া খানিক বাদ দিলেই চলিত তো!' প্রত্যেক পুস্তকের সম্বন্ধে এইপ্রকার অভিযোগ চলিতে পারে; তাহাতে কোনও দোষ দেওয়া যায় না। মানুষের রুচি বিভিন্ন, প্রকৃতি বিচিত্র, প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন।

তৃতীয় কথা,—অনেকে পুস্তকের লেখা, ছাপার হরপ, বেদবাক্য বলিয়া মনে করেন। অবশ্য এই ভ্রম অনেক বয়স্ক লোকেও করিয়া থাকেন। 'আমার মনে আছে, সংবাদপত্রে অমুকের অখ্যাতি উঠিয়াছিল, সে-কি কখনও ভাল হইতে পারে?' ছাত্রেরাও মনে করিতে পারে, এবং সম্ভবতঃ প্রায়ই

মনে করে, যাহা পড়ার বইয়ে ছাপার অক্ষরে আছে, তাহা কদাচ ভুল হইতে পারে না।

সাহিত্য শিক্ষা দিতে গিয়া যদি এইরূপে সৌন্দর্যবোধের হানি ঘটে, এবং পুস্তকপাঠে যদি জ্ঞানের অভাব দূর করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে আমরা তো উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি, এবং ক্রমে ক্রমে আমাদের কর্মকেও ব্যর্থ করিয়া তুলিতেছি। এই বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেই হইবে। বিপদের সম্ভাবনা হয়তো কম, কিন্তু উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যাহাতে এই সম্ভাবনাটুকুর অঙ্কুরেই বিনাশ হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রতিকারের উপায় কিছু কিছু নির্দেশ করা যাইতেছে। সৌন্দর্যবোধ অল্প বয়স হইতেই জাগাইতে হইলে পুস্তক ভিন্ন অন্যান্য উপায়ও হাতড়াইয়া ফিরিতে হইবে। ইউরোপের প্রসিদ্ধ চিত্রশালাগুলির অনুরূপ আমাদের দেশে কিছু না থাকিলেও যাহা আছে তাহার সুপ্রয়োগ প্রয়োজন। আমাদের দেশে ভাল ছবি, যাহাতে মন বাস্তবিক চিরসুন্দরের পায়ে অবনত হইতে শিখে, সংগ্রহ করা যাইতে পারে। অন্ততঃ মাঝে মাঝে ছাত্রদের নিকট তাহা মেলিয়া ধরিলে উদ্দেশ্যসিদ্ধির খানিকটা সহায়তা করা যায়। কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে যাহারা পড়ে তাহাদের পক্ষে বাৎসরিক চিত্রপ্রদর্শনী দেখা কঠিন কথা নয়। যদি সাহিত্যশিক্ষক পাঠ্যবস্তুর সঙ্গে তাহার সংযোগ সাধন করিতে পারেন, তবেই তো তাঁহার কৃতিত্ব।

ছেলেবুড়া সকলেই নাটক দেখিতে ভালবাসে; কিন্তু ছেলে বয়সে মনের উপর নাটক ও অভিনয় যতখানি দাগ রাখিয়া যায়, অন্য বয়সে কি তাহা সম্ভব? ছেলে বয়সে আপনা আপনি নাটকীয় ভঙ্গী, নাটকের কথা, তাহার গান, আসিয়া যায়। শিশু শ্রেণীতে পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গচালনার ব্যবস্থা শিক্ষাবিদ্‌গণ করিতেছেন; বালক ও কিশোরদের শ্রেণীতে উপযুক্ত নাটক পড়াইয়া ও অভিনয় করাইয়া এদিকে সুফল ফলিতে পারে, কল্পনা উজ্জ্বল হইবার অবকাশ পায়। আমাদের সাহিত্যে এরূপ নাটকের একান্ত অভাব নাই; রবীন্দ্রনাথ তো আছেনই, অন্যান্য লেখকদের রচনাও সন্ধান করিয়া লইতে হয়। 'মুকুট', 'কুণাল' প্রভৃতি লইয়া কাজ আরম্ভ করা চলে। চলচ্চিত্রের সাহায্যে ছাত্রগণকে আরও খানিকটা আকর্ষণ করিতে পারা যায়, তবে তাহা ব্যয়সাপেক্ষ, আর প্রচলিত ব্যবস্থায় তাহা দিয়া শিক্ষার কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার কথা নয়।

খানিকটা বাহিরের বই, অর্থাৎ যে বই পরীক্ষায় উত্তী হইবার জন্য পড়া দরকার হয় না, সেরূপ বই পড়াইয়া লইলেও সুবিধা হয়। ছাপার অক্ষরে বিভিন্ন মত প্রকাশিত হইতে দেখিয়া ছাত্র নিজে বিচার করিতে শিখে; তাহা কম লাভ নহে। আজকাল এইরূপ কিছু কিছু বাহিরের বই যে পড়াইয়া লওয়া দরকার, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে, এবং বিদ্যালয়ে দ্রুত-পঠনের জন্য কয়েকখানি বইয়ের ব্যবস্থা প্রত্যেক শ্রেণীতেই করা হইয়া থাকে। কার্যক্ষেত্রে ব্যবস্থা কতখানি অবলম্বন

করা যাইতে পারে তাহা অবশ্য দেখিতে হইবে। তাহা হইলেও শিক্ষকের উপরই এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধ, কি, দীনেশচন্দ্রের রামায়ণী কথা কোনও বিশেষ শ্রেণীর পাঠ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেও, কোনও বিশেষ বিদ্যালয়ে কোনও বিশেষ বৎসর তাহা যে পাঠ্য থাকিবেই বা থাকা উচিত, সে বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া পূর্ব হইতে মোটেই বলা যায় না।

উপরে মাত্র কয়েকটি উপায়ের কথা বলা হইল; ইহাদের সাহায্যে পাঠ্যপুস্তকের সীমাকে লঙ্ঘন করিতে হইবে। বাস্তবিক, শুধু পড়া শুনিয়া নহে, পড়িয়া ও চিন্তা করিয়া তবে জ্ঞান লাভ করা যায়—জ্ঞান অর্জন করিতে হয়। It is not by knowledge but by activity that the intellect is perfected; এরিষ্টটলের এই কথাটি ভারি সত্য। শিক্ষাদানের প্রত্যেক সোপানেই ইহা আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে এবং তদনুসারে কাজও করিতে বা করাইয়া লইতে হইবে। যাহা শেখানো হইতেছে তাহা লইয়া আলাপ আলোচনা না করিলে বিদ্যা কখনও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয় না।

১২

আমাদের শিক্ষকেরা যতই যত্ন করিয়া শিক্ষা দিতে থাকুন না কেন, অনেক সময়েই তাঁহারা ভাল ফল পান না ; এ বিষয়ে পূর্বে বলিয়াছি। অমর কবি ভবভূতির এ বিষয়ে একটি শ্লোক আছে :—

বিতরিত গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে
ন চ খলু তয়ো র্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তি বা ;
ভবতি চ তয়োর্ভূয়ান্ ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্ যথা
প্রভবতি শুচিবিম্বোদ্গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ ॥

আমাদের সমস্যা হইল এই, 'মৃদাং চয়ঃ' বা মাটির ঢেলাকে কি করিয়া শুচি মণি করিয়া তোলা যায়। প্রাচীন কবির এই ভেদ, প্রাজ্ঞ ও জড়, মাটির ঢেলা ও মাণিক—ইহা আমরা মানিয়া লইতে পারি না ; কিংবা যদি মানিয়াও লই, তবে মাণিকদের কথা না ভাবিয়া মাটির ঢেলার কথাই ভাবিব ; আর কবির কথা আবৃত্তি করিয়া বলিব :—

আমার প্রভুর চরণতলে শুধুই কিরে মাণিক জ্বলে ?
চরণে তাঁর লুটিয়ে আছে লক্ষ মাটির ঢেলা।

বলিয়াছি, জ্ঞান অর্জনের বস্তু। শুধু ভাল কথা বলিয়া গেলে কি হইবে ? এই জন্যই ইংরেজিতে একটা কথা আছে, Teaching is not learning.

জনৈক শিক্ষাবিদ্ বলিতেছেন,—

What the learner discovers by mental exercise is better known than what is told him. জ্ঞান ও কর্ম পাশাপাশি চলা চাই, কর্ম না থাকিলে জ্ঞান লাভ করা যাইবে না। তাই শিক্ষার্থীকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে, কর্ম না হইলে জ্ঞানের পরীক্ষাই বা হয় কি দিয়া? কে কত বড় জ্ঞানী, তাহার আচরণ দেখিয়াই না আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি? সৌন্দর্যবোধ কাহার কতটুকু হইল, তাহাও তবে পরীক্ষা করিয়া জানিতে হইবে, অন্যথা শুধু মুখের কথা গ্রাহ্য নহে। সাহিত্যের মধ্যে কি ভাল, তাহা যেন সাহিত্যের ছাত্র বাছিয়া লইতে পারে।

তাহা হইলে, যাহার সৌন্দর্যবোধ হইয়াছে বলিয়া মনে করি, তাহার পরীক্ষা হইবে কি ভাবে? সে সুন্দর জিনিষ বাছিয়া দেখাক, তাহার সেইরূপ চয়নের ক্ষমতা দেখিয়াই তাহার সৌন্দর্য-জ্ঞান আছে স্বীকার করিব। আবার একজন শিক্ষাবিদের মন্তব্য উদ্ধৃত করি :—From the very beginning of his education, the child should experience the joy of discovery (Whitehead). এই ভাবে যদি সে বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর কবিতা, সুন্দর ভাব, সুন্দর উক্তি, সুন্দর বর্ণনা সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলে উহাতে তাহার কার্যতঃ যে শিক্ষা হইল, তাহার আর তুলনা নাই। বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীকে যেমন শিক্ষণীয় বস্তুর নানা আদর্শ সংগ্রহ করিতে হয়, হাতে কলমে কাজ করিতে হয়; উদ্ভিদবিদ্যা-শিক্ষার্থীকে

যেমন বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ্ সংগ্রহ করিতে হয়, নতুবা তাহার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চলে না ; সাহিত্যে তেমনই সাহিত্য-শিক্ষার্থী কেন সুন্দর নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া রাখিবে না ? এই কাজের নাম দেওয়া যাইতে পারে 'স্বয়ং-সঞ্চয়ন', এবং বিজ্ঞানে পরীক্ষাগারে কার্য করার মত ইহার প্রয়োজনীয়তা সমধিক। ইহার সৌন্দর্যতত্ত্ব শিক্ষার কষ্টিপাথর।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে, প্রসিদ্ধ কর্ণেলিয়া সোরবজির ভগ্নী মিস্ লিনা সোরাবজি বঙ্গদেশে বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি উপরিলিখিত স্বয়ংসঞ্চয়নের পরিকল্পনা কর্যে পরিণত করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রথম চারি শ্রেণীতে প্রত্যহ কোনও না কোনও শ্রেণীর ছাত্রীদিগের নিকট হইতে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট প্রকারে স্বয়ং-সঞ্চয়নের কাজ আদায় করিয়া লওয়া হইত। এই 'অতিরিক্ত' শ্রমের জন্য সে কয় বৎসর পরীক্ষার ফল যে খারাপ হইয়াছিল, ইতিহাস সে কথা বলে না। সুতরাং ইহা একেবারে আকাশকুসুম নহে, ইহার পিছনে আছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা।

এই অভ্যাসের এক বিশেষ সুফল আছে। আমরা চিরকালই নীতিপাঠের কথা মুখে মুখে আওড়াইয়া আসিয়াছি। চরিত্র সংশোধনকে আমরা খুব বড় কাজ বলিয়া মনে করি, অথচ জানি যে সেরূপ সংশোধন বড় সহজ নহে। চরিত্র পরিবর্তন করিতে গেলে আগে চাই চিন্তার পরিবর্তন, রুচির পরিবর্তন। আমরা তো কোনও দিক দিয়া রুচি পরিবর্তনের চেষ্টা করি না, সুতরাং তাহার কথা আমাদের হিসাবের মধ্যে

আসে না। রুচি পরিবর্তনের এই এক সুগম পথ আমাদের খোলা আছে, ইহা গ্রহণ করিব কি না তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

এই কার্যের ক্রম বিষয়ে দুই একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কোন ক্লাসে ইহা আরম্ভ করিব? ইহা একেবারে শিশুদের পাঠ্য হইতে আরম্ভ করা সম্ভব নহে। পুনশ্চ হোয়াইটহেডের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করি :- The valuable intellectual development is self-development, and it mostly takes place between the age of sixteen and thirty. আমাদের দেশে বয়সের সীমা দুই তিন বৎসর আগে নামাইয়া আনিতে পারা যায়।

শিক্ষক মহাশয় এই ভাবে কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে গেলে হয়তো দেখিতে পাইবেন যে, ছাত্র যাহা ভাল করিয়া সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা বাস্তবিক ভাল বা সুন্দর নহে। কিন্তু ইহাতে নিরুৎসাহ হওয়ার কারণ নাই। গতিই জীবন; বিকাশ জীবনের পরিচায়ক। কোনটি ভাল লাগে আর কোনটি লাগে না, তাহা লইয়া আমাদের বিবাদের অন্ত নাই; তথাপি মোটামুটি একটা ঐক্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব নহে। সেইজন্য ছাত্রের রুচি যে আমাদের বয়স্কদের মত নয়, ইহাকে স্বাভাবিক বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত, অপরিণতি হইতে পরিণতির পথে পরিচালনা করাই তো শিক্ষকের কাজ।

আজকাল 'চয়নের' খানিকটা চলন হইয়াছে। যাহা ভাল গল্প, যাহা ভাল কবিতা, তাহা লইয়া সাহিত্যিকেরা মালা গাঁথিয়াছেন—প্রকাশকেরা প্রকাশ করিয়া লাভবান হইয়াছেন। যদি ছাত্র, স্বয়ং-সঞ্চয়ন করিতে বলিলে, শুধু তাহা হইতে উঠাইয়া দেয়, নিজে না চেষ্টা করে! তাহা হইলেও বলিব,—উহা মন্দের ভাল। বাহিরের বই পড়িতে শিখুক, তাহার মধ্যে কি ভাল তাহা বাছিতে শিখুক। ক্রমে শিক্ষকের সহায়তায় তাহার রুচির দিক্ খুলিয়া যাইবে, শিক্ষার এই বিশেষ উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হইবে।

ইহার গৌণলাভ হইবে,—স্বাধীন ভাবে বিচারের অবসর মিলিবে, নিজের প্রতি আস্থা আসিবে। ইহা বড় সামান্য কথা নহে। আত্মনির্ভর হইতে যে শিখিল, তাহার শিক্ষার আর বাকি কি রহিল? এবিষয়ে জনৈক ইংরেজ মনীষী বলিয়াছেন,—Eat the pupil's dinner for him if you will, but I beg of you to let him do his own thinking (Baldwin). কথাটি মনে রাখিবায় মত, এবং আলোচ্য বিষয়ে প্রযোজ্য।

ইহাতে আর একটি গৌণলাভ হইবে,—কাব্যের ও সাহিত্যেব অন্যান্য শাখার রূপের দিকে ছাত্রের চোখ পড়িবে। তাহাকে এবিষয়ে বারবার বলিলেও হয়তো সেই ফল ফলিবে না। আমরা সাধারণতঃ সাহিত্যের আন্তর সৌন্দর্য, ভাব-সৌন্দর্যের কথাই ছাত্রদের বলি; কিন্তু সাহিত্যের বাহিরেরও

একটা রূপ, একটা গড়ন, একটা সৌন্দর্য আছে। এইদিকে যাহাতে ছাত্রদের অনুভূতি বাড়ে, তাহার জন্যই বিদ্যালয়ে মাসিক পত্রিকার বা সাময়িক পত্রিকার ব্যবস্থা করা হয়। তাহাতেও স্বয়ং-সঞ্চয়নের জন্য একটু পৃথক স্থান নির্দিষ্ট রাখা যাইতে পারে। ছাত্রদের সভাসমিতিতে, কলেজের সেমিনারে. এই লক্ষ্য রাখিয়াই কাজ হয়।

শিক্ষাবিদ্গণ শিক্ষার যে নীতির অনুমোদন করেন, স্বয়ং সঞ্চয়নের সহিত তাহার বেশ সঙ্গতি আছে। হার্বার্ট স্পেনসার বলিয়া গিয়াছিলেন, ছেলেপুলেদের যত কম বলিয়া পারা যায় ততই ভাল; তাহারা যাহাতে নূতন জিনিষ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে; তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহার দিকে তাহাদিগকে লওয়াইতে হইবে। Children should be told as little as possible, and induced to discover as much as possible. এই ভাবে বিদ্যাকে আয়ত্ত না করিতে পারিলে, লাভ হইল কি? এই জাতীয় পদ্ধতিকেই রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' নাম দিয়াছেন। আমাদের বিদ্যালয়ের ধরা-বাঁধা পদ্ধতির ব্যাঘাত না জন্মাইয়াও ইহার স্থান করা যাইতে পারে, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা অবশ্য দরকার। শিক্ষক যদি ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারেন, আশা করা যায় যে তাঁহার কর্মে কোনও দিক হইতেই বাধা থাকিবে না; তবে তাঁহাকে এজন্য সামান্য পরিশ্রমও করিতে হইবে,—নিজেকেও বাছিতে ও বিচার করিতে হইবে, ছাত্রদের মধ্যে ইহার অভ্যাস যাহাতে বাড়ে তাহাও দেখিতে

হইবে। এরূপ করিলে শিক্ষকের নিজের নিকটেও বিদ্যা-দান শুষ্ক বলিয়া মনে হইবে না, তাহা গৌণ হইলেও মহৎফল।

নীচে দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

'কোথা নাই কোথা নাই
        ঘরমুখো বাঙ্গালী ?
ধন্য সে গণ্য সে
        আর নয় কাঙ্গালী।

পশ্চিম পূজা দেয় আজি তার রবিকে,
ভাণ্ডাল ভুন গথ পূজে তার কবিকে,
গুণী তার কথা কয় তরু সনে আড়ালে
ডাকে তার সাড়া দেয় বুনো বনচাঁড়ালে।
তিরাই-এর জঙ্গলে, বিপাশার বুকে সে,
বর্মার তেলকলে, মেঘনার মুখে সে!
পেশোয়ারে তার-ঘরে, কুমারীতে কেরাণী,
কোয়েটায় ধূলি খায়, কি কঠিন পরাণই।
গুজরাটে ডাকবাবু, লুণ্ডীতে পোদ্দার,
চিত্রালে দেন্‌দার--নাই তার উদ্ধার।
ইরাবতী পাড়ি দেয়, কাবেরীতে সাঁতারে,
নর্মদা মর্মরে রাজকাজ হাতাড়ে।
লড়ে গিয়া ব্রেজিলেতে, পড়ে গিয়া জাপানে,
মার্ণে সে গোলা দাগে, চড়ে উড়ো ঝাঁপানে!
পরিখার মাঝে তার আছে হাড় ছড়ানো,
রাইনের বুকে আছে, ভুলে গেছে ডরানো।

মিশে আছে পিষে আছে নেটালের খনিতে,
শোণিতের দাগ তার আছে নীলামণিতে।

চয়ন করিতে করিতে এইরূপ কবিতা খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব নহে। চতুর্থ বা তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র এরূপ কবিতার সন্ধান দিলে আশ্চর্য্য বোধ করিব না। সচরাচর প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক বা চয়নগ্রন্থে কিন্তু ইহা পাই নাই।

প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের নিকট হইতে হয়তো নিম্নলিখিত রূপ কবিতা পাওয়া যাইবে।

সাধের আকাশতলে কি জানি কি আলো জলে,
কি জানি কি গান উঠে মনো-বন-কুঞ্জে।
হৃদয়ের তলে তলে হরষের ধারা চলে
বিস্মৃত জীবনের দুখ-শোক-পুঞ্জে॥
ধ্বনিত করিয়া দিক্ আজ শুধু গাহে পিক
আজি আমি নহি ওরে সাথীহীন যাত্রী।
রাজপথে দলে দলে আজি কত সাথী মেলে,
বিস্মৃত আজি সুখে তমোময় রাত্রি।

স্বয়ং-সঞ্চয়নের অভ্যাস বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে করাইতে পারিলে প্রকৃত রসবোধের সাহায্যই করা হইবে।

১৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অনুবাদের স্থান বড় সামান্য নহে। কি করিয়া অনুবাদ এই স্থান লাভ করিল, তাহা জানিতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। অথচ ম্যাট্রিকুলেশন বা প্রথম পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া এমন কি সর্বোচ্চ চাকুরিতে লোক লওয়ার পরীক্ষায় পর্যন্ত, অনুবাদ করানো হইয়া থাকে,—ইংরেজি হইতে বাংলা ও বাংলা হইতে ইংরেজি অনুবাদ অবশ্যকরণীয়। ইহার সংখ্যাগত মূল্যও সামান্য নহে। তথাপি একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, ভাষাশিক্ষার পক্ষে অনুবাদ বাস্তবিক কোনও সাহায্য করে কি? কেহ কেহ বলেন, ইংরেজি হইতে বাংলা করিতে গেলে, বা বাংলা হইতে ইংরেজি করিতে বসিলে, শিক্ষার্থী কোনও ভাষায়ই নৈপুণ্য দেখাইতে পারে না, অনর্থক তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তোলা হয়। বাংলা ভাষায় শিক্ষার্থীর কোনও অধিকার আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে বাংলা ভাষায় রচনা করিতে বলিলেই তো যথেষ্ট, ইহার মধ্যে ইংরেজি আনিয়া ব্যাপারটি আরও ঘোলাইয়া দিলে লাভ কি?

অনুবাদ করিতে বলায়, এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় প্রকাশের ব্যবস্থায়, একটা উদ্দেশ্য আছে : রচনায় নিজের ভাব

ভাষায় ফুটাইতে হয়, অনুবাদে অন্যের ভাষার প্রতিধ্বনি করিতে হয় ; এই পার্থক্য বড় কম নহে। নিজের ভাব প্রকাশের ভাষা আপনি আসিয়া যায় ; অন্যের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা খুঁজিতে হয়, পরীক্ষা করিতে হয়, তৌল করিতে হয় যে স্থানোপযোগী হইবে কি না। এইখানেই অনুবাদের পরীক্ষা।

আর এক দিক দিয়া অনুবাদ শিখাইবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আপত্তি বা অভিযোগ উঠিয়াছে। বাংলা ভাষায় এমন কথা অনেক আছে, যাহা ইংরেজিতে প্রকাশ করা যায় না আবার ইংরেজিতে এমন অনেক কথা আছে, যাহার অনুরূপ শব্দ বাংলায় খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব বলিলেও চলে। The horse is a noble animal—এই সামান্য কথাটার বাংলা অনুবাদ করিতে গেলে ব্যাপারটি যে হাসিয়া উড়ানো যায় না, তাহা সকলে স্বীকার করিবেন।

উভয় ভাষায় প্রকৃতিগত বিরোধ থাকা তো স্বাভাবিক। ইংরেজিতে অসমাপিকা ক্রিয়ার পরিমাণ কম, বাংলায় বেশি ; কিন্তু বাংলায় ক্রিয়াবাহুল্য কম করিয়া রচনাকে আরও সংহত করিবার চেষ্টাই ভাল। অনুবাদের সময়েও এই রীতি অনুসরণীয়। অধিকাংশ বাঙ্গালীই সম্ভবতঃ ইংরেজি লিখিতে গিয়া শব্দঘটার সৃষ্টি সহজ মনে করিবেন, কিন্তু বাংলায় শব্দঘটা কিছুতেই প্রস্তুত করিতে পারিবেন না,—ঠেকিয়া যাইবেন। ইংরেজিতে possessive pronoun-এর অর্থাৎ 'his' 'her' 'mine' প্রভৃতি কথার প্রতিশব্দ বাংলায় থাকিলেও তত বহুল

প্রয়োগ নাই। I was going to my study 'আমি পড়িবার ঘরে যাইতেছিলাম' বলিলেই সুষ্ঠু হইবে। জাতীয় মনোবৃত্তি হইতে এই অধিকারবোধের অভাব হয় কিনা তাহা লইয়া একটু কল্পনা করা মন্দ নয়, কিন্তু কল্পনার কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের ভাষার প্রকৃতিই যে অন্যরূপ তাহা বুঝিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

অনুবাদ করা বড় সহজ নয়। ভাল ইংরেজির অনুবাদ করা বড় কঠিন। শেক্সপীয়রের অনুবাদ আমাদের দেশের বড় বড় লেখকেরা করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই; অনুবাদের কাজ যে কঠিন. তাহা কি ইহাতে বুঝিতে পারা যায় না? ভাষাকে এত ঘষিতে মাজিতে হয় যে তাহার শক্তি থাকে না; মূল লেখক যত জোরে কথা বলিয়াছেন, অনুবাদক যদি অনুরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়া তত জোরে কথা না বলিতে পারেন, তাঁহার সমগ্র কথাটির যদি সেই জোর না থাকে, তবে তাঁহার কাজ সেই পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

অনুবাদের সাফল্য, অভ্যাস ও চর্চার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। "যাহা আছে, বাড়ে চালনায়"—কবির এই উক্তি অনুবাদের সম্বন্ধেও বেশ খাটে। চর্চায় ইহাতে নৈপুণ্য এত খানি বাড়ে যে, খসড়া অনুবাদই ভাল অনুবাদ হয়, তাহা আর ঘসিয়া মাজিয়া পালিশ করিবার প্রয়োজন থাকে না। আমরা এ কথা ভুলিয়া, মাসে বা বৎসরে একবার অনুবাদ করাইতে চাই; সুতরাং আমাদের চেষ্টায় কোনও ফল হয় না। অথচ

ছয় মাসের চেষ্টাতেই একটা বেশ ফল পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ে এরূপ দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টার বিরুদ্ধে আপত্তি আছে,—বৈচিত্র্যের অভাবে ও একই বিষয়বস্তুর অনুশীলনে একঘেয়ে লাগিতে পারে ; এদিকটা অবশ্য ভাবিয়া দেখা দরকার।

অনুবাদে সাফল্য অনেক বই পড়ার উপরও খানিকটা নির্ভর করে। একবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আই, এ, পরীক্ষায় ইংরেজি হইতে বাংলায় অনুবাদের অংশে Livingstone-এর নাম ছিল ; একাধিক পরীক্ষার্থী 'জীবিত পাথর' নাম দিয়া অনুবাদ করিয়াছিল। তাহারা সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ পর্যটকের নাম কখনও শোনে নাই ; শুনিয়া থাকিলে এরূপ লিখিত না। ইংরেজি বই না পড়িলে অনেক প্রকাশভঙ্গীর মর্ম বুঝিতে পারা যায় না। এইবারকার প্রশ্নপত্রে দেখিলাম, at best fifty paces round—বিদ্যালয়ের ছাত্রের পক্ষে ইহার বাংলা করা কঠিন হইবার কথা নয়, কিন্তু অর্থ বোঝা দরকার। অর্থ না বুঝিতে পারিলে অনুবাদ করার সম্ভাবনা পর্যন্ত থাকে না। রসরাজ অমৃতলাল তাঁহার এক হাস্যরসের নাটকে under the painful necessity বাংলায় তরজমা করিয়া 'যন্ত্রণা-দায়ক আবশ্যকতার তলদেশ দিয়া' বলিয়াছিলেন। লোকে অভিনয় দেখিতে আসিয়া এক চোট খুব হাসিয়া লইল। আমাদের অনুবাদেও অনেক সময়ে এইরূপ ভাবায় গোলমাল থাকিয়া যায়, সে ক্ষেত্রে আমাদের অজ্ঞতাবশতঃ।

অনুবাদ শিখাইবার জন্য আমাদের দেশে কেহ কেহএকরূপ অভিনব উপায় অবলম্বন করেন। ভাল বাংলার নিদর্শন তাঁহারা

গ্রহণ করেন, তাহার পর সেই বাংলা রচনা নিজেরাই ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এই ইংরেজি অনুবাদটি বাংলা করিবার জন্য ছাত্রদিগকে দিলে তাহারা হয়তো ভাল বাংলা, অর্থাৎ মূলের অনুরূপ, লিখিতেও পারে। শিক্ষক মহাশয় যদি ইংরেজি অনুবাদ খুব সুন্দর নাও করিতে পারেন, তাহাতে তেমন কিছু আসে যায় না ; কিন্তু ছাত্রদের সম্মুখে যে ইংরেজি অনুবাদ থাকিবে, তাহার মধ্য দিয়া মূল বাংলার সৌন্দর্যের ছায়ার সন্ধান পাওয়া যাইবে। তাহাতে ভাষার উপর দখল বাড়িবে। অনুবাদ শিক্ষার উদ্দেশ্য কিছু পরিমাণে সিদ্ধ হইবে।

১৪

এই পুস্তকের আদিতে পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতে গৃহীত একটি প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করিয়াছিলাম ; কিমর্থমধ্যেয়ং ব্যাকরণম্? আজ এই প্রশ্ন আবার শিক্ষকদের কাহারও কাহারও মুখে শোনা যাইতেছে ; ব্যাকরণ কেন পড়াইব? ব্যাকরণ পড়াইয়া কি হইবে? 'কানি পুনঃ শব্দানুশাসনস্য প্রয়োজনানি?' পতঞ্জলি এই প্রশ্নের বহু উত্তর দিয়াছিলেন। 'রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্' তো বটেই, তা ছাড়া আরও কিছু। আজকালকার বৈয়াকরণিকেরা কি উত্তর করেন তাহা জানিবার বিষয়।

বাংলা ব্যাকরণ পড়িতে হইবে বা পড়াইতে হইবে, প্রাচীনেরা অবশ্য একথা কখনও ভাবেন নাই। মাতৃভাষা যাহার বাংলা, তাহাকে আবার বাংলা ব্যাকরণ শিখাইতে হইবে কেন ? সে তো প্রয়োগ জানে, এবং প্রয়োগ হইতেই ব্যাকরণের নিয়মাদি ধরিতে পারিবে। বিদেশীকে অবশ্য ব্যাকরণ শিখিতে হইবে, তাহার ফলে সে নূতন নূতন পদের প্রয়োগ শিখিতে ও বুঝিতে পারিবে। পোর্তুগীস পাদ্রী মানোয়েল-দা-আস্সুম্ সাঁউ এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়াই পোর্তু-গীস ভাষায় বাংলার ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। সে আজ প্রায় দুই শত বৎসর হইল। তাহার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে হাল্‌হেড সাহেবের বাংলাভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। বাংলার ব্যাকরণ লিখিবার সময় হাল্‌হেড সাহেব এই বলিয়া ভূমিকা করিয়াছিলেন :—

বোধপ্রকাশ" শব্দশাস্ত্র"
ফিরিঙ্গীণামুপকারার্থ"
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী।

এ ব্যাকরণ 'ফিরিঙ্গিদের' জন্য ইংরেজী ছাঁচে লেখা ; আজ পর্যন্ত যে সকল ব্যাকরণ লেখা হইয়াছে তাহাতে ইংরেজি ছাঁচ আমরা একেবারে বর্জন করিতে পারি নাই।

বাংলা ব্যাকরণ বিদ্যালয়ে শিখাইবার উদ্দেশ্য : (১) ছাত্রকে ভাষার জ্ঞানে অনুরাগী করা, ভাষার মধ্যে যে নিয়ম আছে তাহাকে সহজ করিয়া লওয়া ; (২) ভাষার বিপদ কোথায়, তাহার সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দেওয়া, যাহাতে বিভিন্ন পদের

সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায় ; (৩) অন্যান্য ভাষা শেখার পথ প্রশস্ত করা। বাক্যের মধ্যে যে বিভিন্ন পদ আছে, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ব্যাকরণ পরিষ্কার করিয়া ধরিবে, প্রত্যেক পদের গঠন বলিয়া দিবে, জটিল বাক্যকে সরল করিয়া লইতে পারিবে, বাক্যাংশের সহিত সমগ্র বাক্যের সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিবে। ভূদেব বাবুর মন্তব্যের কথা স্মরণ করি :—

ব্যাকরণ জ্ঞান না থাকিলে উত্তম আর্থিকতাও হয় না, সুতরাং সাহিত্যশাস্ত্রের সম্যক অর্থগ্রহ হইতে পারে না।

এখন কেহ কেহ বলিতেছেন, মাতৃভাষার ব্যাকরণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার কোনও প্রয়োজন নাই। আমরা শুনিয়া শুনিয়া মাতৃভাষার প্রয়োগ শিখি, শাস্ত্রচর্চা করিয়া প্রয়োগ শিখি না। যাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিবে, অর্থাৎ বিদ্যালয়েই যাহাদের শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটিবে না, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে, তাহারা যত ইচ্ছা ব্যাকরণ পড়ুক ; শিক্ষক যাঁহারা, তাঁহাদের পক্ষেও ব্যাকরণের মূল্য আছে ; কিন্তু যাহারা সাধারণ ছাত্র, তাহাদের পক্ষে ব্যাকরণ পড়া সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহার নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে,—বিভিন্ন বর্ণের উচ্চারণস্থান, টবর্গ যে মূর্ধণ্য, তবর্গ যে দন্ত্য, পবর্গ যে ওষ্ঠ্য, এরূপ কথা যে বয়সে পড়ানো হয় সে বয়সে ছাত্রেরা কিছুই বুঝিতে পারে না ; শিক্ষক মহাশয় যদি উচ্চারণ শুদ্ধ বা স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, তবে তাঁহার এ সব জানা উচিত ; কিন্তু ছাত্রেরা জানিতে চাহিবে কেন ? স্পষ্ট উচ্চারণ তাহারা শুনিয়া শিখুক ; তাহাই যথেষ্ট

নয় কি ? এই আপত্তির উত্তর আলোচনা সাপেক্ষ, এবং সে আলোচনা শিক্ষকদের দিক হইতে হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে ইহাও অনুসন্ধান করা উচিত যে, আধুনিক যুগে স্পষ্টতার যে হানি ঘটিতেছে, ব্যাকরণের প্রতি অমনোযোগ তাহার জন্য কতখানি দায়ী !

শিশুশ্রেণীতে ব্যাকরণ শিখাইবার প্রয়োজন অধিকাংশ লোকে বোধ করেন নিশ্চয় ; নতুবা প্রাথমিক শিক্ষার সকল পরিকল্পনাতেই ব্যাকরণের একটা প্রশস্ত স্থান কেন দেখিতে পাই ? আমাদের দেশে অধুনা প্রচলিত পাঠ্যসূচীতে ব্যাকরণকে পাঠ্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু পৃথক পুস্তকের ব্যবস্থা করা হয় নাই,—সাহিত্যপাঠের মধ্যেই ব্যাকরণের জন্য অল্প কয়েক পৃষ্ঠা থাকিবে, এরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে। শিশুদের ব্যাকরণের প্রসঙ্গে আবার মনে পড়ে ভূদেববাবুর কথা :—

> শিশুদিগের কোমল মুখে কেবল নিয়মময় অস্থিসার-সর্বাঙ্গ ব্যাকরণ নিক্ষেপ করা অকর্তব্য বোধ হয়।

কিন্তু কেবল নিয়ম এখন শেখানো যাইবে না ; শেখানো যাইবে ব্যাকরণের সাধারণ জ্ঞান,—বাক্য ও তাহার বিভিন্ন অংশ, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ। আমরা অনেকে যেমন সন্ধি হইতে আরম্ভ করি, শেষ করি গিয়া বাক্যে, তেমন না করিয়া তাহার বিপরীতভাবে অগ্রসর হইতে হইবে ; আগে বাক্য, তাহার পর তাহার উদ্দেশ্য ও বিধেয়, তাহার পর

বিশেষ্য ও ক্রিয়া—এইরূপে। পাঠ্যসূচীতে অবশ্য কোন্ শ্রেণীতে কতখানি শেখানো যাইতে পারে, তাহার একটা হিসাব দেওয়া আছে। কিন্তু প্রণালীটি উল্টাইয়া দেওয়া উচিত,—দুই একটি পুস্তিকায় তাহা দেওয়াও হইয়াছে।

দশ বার বৎসর বয়সে যখন ছেলেমেয়েদের তর্ক বা বিচারের শক্তি জন্মে, তখন বা তাহার পরে ব্যাকরণ পড়াইলে তাহাদের বিচারের শক্তি বাড়ে, পর্য্যবেক্ষণের শক্তিও বাড়ে, ভাষারও সম্যক্ জ্ঞান জন্মিতে পারে। শিশুশ্রেণী পার হইয়া গেলে ব্যাকরণ সম্বন্ধে আর একটু অগ্রসর হওয়া যায়; কিন্তু সেখানেও সতর্কবাণী শুনিয়া রাখা প্রয়োজন। নিয়ম জানিবার পূর্বে দৃষ্টান্ত জানা চাই; দৃষ্টান্ত যত মনে রাখিতে পারিব নিয়ম তত সহজ বোধ হইবে; নিয়মকে তখন নিগড় বলিয়া মনে হইবে না, স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইবে। যদি শিক্ষার্থীকে দিয়াই নিয়ম প্রণয়ন করিয়া লওয়া যায়, তবে আরও ভাল। আমরা দৃষ্টান্তের সাহায্যেই ব্যাকরণের নিয়ম মনে রাখি; দৃষ্টান্তগুলি সুগৃহীত হইলে শিক্ষার্থীর অনুরাগ জন্মিবে। পুস্তকে লিখিত ব্যাকরণের সূত্রকে কি মূল্য দিব, তাহা কতকটা দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিতেছে। পুস্তকের ও পাঠের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ, গৃহীত দৃষ্টান্তের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিচার করিয়া স্থির করা হয়। সুতরাং শিক্ষককে দৃষ্টান্ত সংগ্রহের জন্য সময় দিতে হইবে।

ব্যাকরণ পড়াইতে গিয়া আমরা আরোহপ্রণালীরই অনুসরণ করি। আগে সূত্র, তাহার পর দৃষ্টান্ত, এমনটি না হইয়া

আগে দৃষ্টান্ত, পরে সূত্র—এইরূপই হওয়া উচিত। এই প্রণালী সকল শ্রেণীতেই অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন।

বাংলা ব্যাকরণ আজকাল ভাষার দুইটি রূপ লইয়াই আলোচনা করে ; সাধুরূপ ও চলিতরূপ। ভূদেববাবুর সময়ে বিদ্যালয়ে ভাষার চলিতরূপ যে শিক্ষা দেওয়া হইবে, এই ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। তাঁহার নিজের মন্তব্য এই :—

প্রকৃত সংস্কৃত ধাতু সকলের নাম শিক্ষা দেওয়াই বিধেয় ; 'হোচট খাই' বা 'ধরা পড়ি' অথবা 'হড়্‌কান' প্রভৃতি ধাতুর রূপ শিক্ষায় কোন বিশেষ ফল হয়, ইহা বোধ হয় না।

কিন্তু আজকাল ইহা আর সম্ভব নহে ; বাংলা ভাষার চলিতরূপ আজ শিষ্টরচনায়ও সমাদর লাভ করিতেছে ; সুতরাং তাহা শিখিতে হইবে বই কি। ব্যাকরণ শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হইতে পারে না, যদি আমরা চলিতরূপকে হিসাবের মধ্য হইতে বাদ দেই। চলিতভাষা হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে হইবে ; সাধুভাষা ও চলিতভাষা বাংলায় যে একই নিয়মের অনুসরণ করে ; তাহা আমরা দেখিতে পাইব ও ছাত্রেরা জানিতে পারিবে। ব্যাকরণ নিয়মের রাজ্য—ভাষা ও নিয়ম মানিয়া চলে—এই বোধ জন্মানো ব্যাকরণ শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

সাহিত্য শিক্ষার সম্পর্কে ব্যাকরণ পড়াইবার তেমন প্রয়োজন নাই ; কিন্তু রচনা শিখাইবার সময় উহার জ্ঞান প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। বাক্যগঠন, শব্দপ্রয়োগ, বিভিন্ন পদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয়—এই সমস্ত করিতে গেলে

ব্যাকরণের নিয়ম জানা চাই, সচরাচর কি হইয়া থাকে তাহা জানা চাই, নতুবা মাঝে মাঝে ধাঁধায় পড়িতে হয়। তখন সন্দেহের নিরসন করিবার পক্ষে ব্যাকরণ পরম উপকারী শাস্ত্র।

যাহা নিয়মের মধ্যে পড়ে না, অর্থাৎ সূত্রের যাহা বহির্ভূত, যাহাকে আমরা সূত্রের মধ্যে স্থান দিতে পারি নাই ; অর্থাৎ নিপাতনে সিদ্ধ, তাহা শিশুশ্রেণীতে পড়ানো উচিত নয়। একেবারে কৈশোর শ্রেণীতে তাহার স্থান ; প্রশ্নের সময়েও যাহা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত তাহাকে বাদ দিয়া রাখিতে হইবে ; কারণ শিক্ষার্থীর মন পড়িয়া থাকা উচিত যাহা নিয়মের অধীন তাহারই উপর। 'মনীষা' সন্ধি-বিচ্ছেদ করিতে পারিলেই সন্ধির জ্ঞান যে আছে তাহার পরিচয় দেওয়া হইল না। 'মহা' ও 'ঋষি' মিলিয়া যে 'মহর্ষি' হয়, 'নর' ও 'ঈশ' মিলিয়া 'নরেশ হয়, তাহার জ্ঞান আরও প্রয়োজনীয়।

ব্যাকরণ পড়াইবার পূর্বে ব্যাকরণের জ্ঞান থাকা চাই ; অভিজ্ঞতা হইতে জানিয়াছি, একথা বলা অনাবশ্যক নহে। অনেক সময় দেখা যায়, শিক্ষকের মনেই ব্যাকরণের ধারণা পরিষ্কার নাই। বিভক্তি কাহাকে বলে, কৃত্তদ্ধিতের পার্থক্য কি, সমাস ও সন্ধির সাদৃশ্য ও প্রভেদ কোথায়,—এই সকল প্রাথমিক জ্ঞান শিক্ষকদের থাকা উচিত, কিন্তু কখনও কখনও থাকে না। সেরূপ ক্ষেত্রে শিখাইবার প্রণালী শিক্ষা করিবার পূর্বে বিষয় শিক্ষা করা উচিত।

এই প্রকরণ শেষ করিবার পূর্বে জনৈক ইংরেজ শিক্ষকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিই, আমাদের ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যাপারে তাঁহার মন্তব্য প্রযোজ্য :—

The teacher should be careful to preserve a sense of proportion. He should avoid obsolete and burdensome pedantries, the multiplication of arbitrary rules and the teaching of subtleties and niceties that are beyond his pupils' comprehension or of no practical use to them. Nor should he forget that grammar was made for language, not language for grammar. ...The grammar taught should deal with the normal rather than the abnormal, and by showing the children that language is rational should help them to use it with accuracy and confidence.

১৫

"বিদ্যালয়ে পড়াইতে গিয়া আজকাল দেখা যায়, বর্ণাশুদ্ধির পরিমাণ যেন খুব বাড়িয়া গিয়াছে। বানান কেন ভুল হইবে ? বানান ভুল হওয়া একটা লজ্জার বিষয় হওয়া উচিত। আমাদের সময়ে ইস্কুলের ছেলেদের এত বেশি বানান ভুল হইত না। আজকাল নানাদিকে শিক্ষার সংস্কার চলিতেছে, তাহা সত্ত্বেও ভুলের পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছে ; এরূপ বাড়িতে দেওয়া সঙ্গত নহে।"

সত্যই এ অভিযোগের মূলে কিছু সত্য আছে : বানান-ভুলের সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। দিন দিন একথার সত্যতা উপলব্ধি করিতেছি। উচ্চতম শিক্ষাকেন্দ্রে, অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মধ্যেও, বর্ণাশুদ্ধি বিরল নহে। যে সব কথা অতি সহজ, জটিলতার লেশমাত্র যাহাতে নাই, তাহা লইয়াও লোকের গোল বাধে। চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না যে এত ভুলও মানুষ করিতে পারে। বানান ঠিক না জানিলে যে শিক্ষাই সম্পূর্ণ হইল না, আমাদের শিক্ষকেরা একথা কেন বুঝেন না। কথায়ই যে বলে, "যাহার ষত্বণত্ব জ্ঞান নাই—!"

কিন্তু কেন বানান ভুল হয়, তাহা একটু মন দিয়া বুঝিতে হইবে। রোগের কারণ না জানিলে তাহার প্রতিকার হয় না। তাই নিদানশাস্ত্র আয়ুর্বেদের এক অপরিহার্য অঙ্গ।

আমরা যেমন উচ্চারণ করি তেমনই বানান করিবার প্রবৃত্তি হয়। এই প্রবৃত্তি বাধা পায় সংস্কারের নিকট। বানান স্থায়ী রূপ লইয়া চিরন্তন বাসা বাঁধিতে চায় ; ওদিকে শব্দের উচ্চারণ ধীরে ধীরে কালমাহাত্ম্যে পরিবর্তনের পথ ধরিয়াছে, কেহ তাহা লক্ষ্যও করে না। একদিকে স্থায়িত্বের প্রতি লোভ, অন্যদিকে নব নব পরিবর্তনের স্পৃহা—এই দ্বন্দ্ব বা বৈষম্যের মধ্যে সাম্য সংস্থাপন করিবার জন্য মাঝে মাঝে সংস্কারের চেষ্টা প্রয়োজন। পুরাতনকে অদল বদল করিয়া পরিবর্তনকে মানিয়া লইতে হইবে বৈ কি।

বর্ণসংস্কারের চেষ্টা কিছু নূতন নহে। রোমানদের মধ্যে ক্লডিয়াস্ সম্রাট হইবার পূর্বে তাঁহার দুরবস্থার দিনে এ বিষয়ে

একটি পুস্তিকা লিখেন। লাটীন অভিধান প্রথম প্রণয়ন করেন ভেরিয়াস্ ফ্ল্যাকস্ (Verrius Flaccus)—তিনি প্রস্তাব করেন যে M কে কাটিয়া দুই ভাগ করা হউক, এবং শব্দের অন্তে যে M থাকিবে তাহা পূরাপূরি উচ্চারিত হয় না বলিয়া তাহার স্থানে ঐ কাটা M অর্থাৎ Λ বসান হইবে। ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীতে I ও J, U ও V—পৃথক বলিয়া তেমন ধরা হইত না। ইংরেজি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে নোয়া ওয়েবষ্টার অভিধান লেখেন,—আমাদের ছেলেবেলায় 'ওয়েবষ্টার ডিক্সনারি' নামে তাহার খুব আদর ছিল, তাহাতে প্রচলিত বানানের রূপান্তর, বিশেষতঃ আমেরিকান রূপ দেওয়া হইত—আর যদি তাহার মূলগত রূপের সন্ধান পাওয়া যাইত তবে তো কথাই ছিল না। 'Bridegroom না দিয়া bridegoom কেন দেওয়া হইবে না?' এই প্রশ্ন তখন উঠিয়াছিল—কারণ শেষোক্ত কথাটির অর্থ—bride এর guma অর্থাৎ লোক—কনের লোক, সুতরাং বর। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ধ্বন্যাত্মক বর্ণমালার বুনিয়াদ বসিল।

বাংলাদেশে বর্ণমালা-বিভীষিকার প্রতি রসিক ও চিন্তাশীল লেখকেরা পণ্ডিতদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিরাছিলেন। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের চেষ্টা এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রস্তাবিত সংস্কারের কিয়দংশ গৃহীত হইতে চলিয়াছে, অন্ততঃ আমরা আজকাল তাঁহার প্রস্তাবিত বর্ণসংস্কার-প্রয়াসকে আর একেবারে উপেক্ষা করি না। ক্রমে দেশময় কথা বাড়িতে লাগিল। কলিকাতা

তাহা চালাইবার বা বহুল-প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হয়। অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রন্থগুলি যদি এই সিদ্ধান্তের অনুযায়ী মুদ্রিত হইত, তাহা হইলেও ইহা প্রবর্তিত হইবার বা বহুলোকের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার সুযোগ পাইত।

দোষ তো খানিকটা বোঝা গেল। প্রতিকারের উপায় কি? প্রথমতঃ বানান সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হওয়া উচিত। বহুদিন পূর্বে অক্সফোর্ডের অধ্যাপক আর্লসাহেব ইংরেজি বানান সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,

The present rigorous examination in orthography ought to be greatly relaxed, if not altogether discontinued. as involving a great waste of unprofitable effort.

এই মন্তব্য সমীচীন, এবং বাংলা পড়ানোর ব্যাপারেও ইহা মানিয়া কাজ করা উচিত মনে করি।

দ্বিতীয়তঃ, মাঝে মাঝে এ উদ্দেশ্যে শ্রুতিলিখনের ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হয়। শিক্ষক মুখে যাহা বলিবেন, ছাত্র তাহা সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া দেখাইবে। এই কার্য শিক্ষক নিজে না করিয়া অন্য ছাত্র দিয়াও করাইতে পারেন। যে সব কথার বানান ভুল হইবে, তাহা কয়েক বার করিয়া লিখিলে শোধরানো যাইতে পারে। তবে এ বিষয়ে একটা কথা বলা দরকার; বেশিবার, অর্থাৎ কলের মত লিখাইলে,ছাত্রদের কোনও উপকার হয় না। যে কয়বার বুঝিয়া, বা মুখে বলিবার সঙ্গে সঙ্গে,

লেখানো যাইতে পারে তাহাই ভাল—সুতরাং পাঁচ কি দশ বারের বেশি লেখানো উচিত নহে। বেশিক্ষণ ধরিয়া কি বেশি বার লিখাইতে গেলে ছাত্রের যত্ন শিথিল হইয়া আসিবে। তাহাতে এরূপ চেষ্টার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

তৃতীয়তঃ মাঝে মাঝে পাঠ্যপুস্তক হইতে নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদের প্রতিলিপি করিতে দিলে ভাল হয়; যে অংশের প্রতিলিপি করিতে হইবে, তাহা বেশি বড় না হয়, এবং তাহার মধ্যে এমন সব কথা থাকা চাই যাহার বানান ভুল হইবার সম্ভাবনা।

চতুর্থতঃ, বানান লইয়া খেলা। শব্দগঠন লইয়া ইংরেজি খেলা আছে, কিন্তু আমি ঠিক সে কথা বলিতেছি না। আমি বলিতেছি, শব্দগঠনের চেষ্টায় যাহাতে কঠিন শব্দগুলির বিভিন্ন অংশের প্রতি লেখকের দৃষ্টি পড়ে, সেজন্য শিক্ষককে কৌশল করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ, শিক্ষককে নিজে সতর্ক হইতে হইবে, তাঁহার ভুল হইলে ছাত্রদের সংশোধন অতি দুরূহ ব্যাপার।

ষষ্ঠতঃ, বহুক্ষেত্রে বানান ভুলের মূলে আছে ছাত্র বা ছাত্রীর শারীরিক দুর্বলতা, বিশেষ করিয়া দৃষ্টি বা শ্রবণশক্তির দুর্বলতা। চিকিৎসক দেখাইয়া ইহার আশু প্রতিকার না করিলে ভুল বানানের অভ্যাস থাকিয়াই যাইবে।

অভিধান দেখিবার অভ্যাস করানো দরকার। 'অভিধান দেখিও' বলিলেই হইবে না; কি করিয়া অভিধান দেখিতে হয়, অভিধানে শব্দগুলি পরপর কি ভাবে সাজানো থাকে, অভিধানে

যে সকল অর্থ দেওয়া থাকে তাহার মধ্যে প্রসঙ্গের অনুযায়ী অর্থটি কি করিয়া বাছিয়া লইতে হয়, এ সমস্তই শিখাইতে হইবে। পাঠ্যপুস্তকের মত অভিধানও বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী হওয়া উচিত, শুধু বৃহৎকায় অভিধান দেখাইলে চলিবে না।

যদি বিদ্যালয়ে এমন ছাত্র থাকে যে এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াও তাহার ভুল শোধরানো যায় না, তবে তাহার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে মন দেওয়া উচিত,--মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে তাহার অক্ষমতার কারণ খুঁজিতে হইবে। ভবিষ্যতে এরূপ অনুসন্ধানের ফল ঐ ছাত্রের সম্বন্ধে অন্য ক্ষেত্রে বা অন্য ছাত্রের কাজে লাগিতে পারে।

১৬

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়াইতে আসিয়া প্রথমে আমরা আদর্শ স্থির করিয়া লইতে চাই, ছাত্রদিগকে বলিয়া বেড়াই—আমরা তোমাদিগকে ভাষা ও সাহিত্য শুদ্ধ করিয়া শিক্ষা দিব, যাহাতে ভুল না হয়। বাস্তবিক যদি শুদ্ধ ভাষা না শিখাইলাম, যদি আমরা ভুলই শিখাইলাম, তবে সে শিক্ষার সার্থকতা কি? ইংরেজিতে একটা কথা আছে—Accuracy is the soul of scholarship : পাণ্ডিত্যের মাপকাঠি হইল তাহার শুদ্ধ জ্ঞান, নির্দোষ জ্ঞান। যাহা জানিব তাহা ঠিক ঠিক জানিব, ভুল

জানিব না, ভুল শিখিব না ; ভুল জানার চেয়ে না জানাও ভাল, কারণ তাহাতে দ্বিগুণ সময়ের দরকার হয় না। একে তো যাহা ভুল জানিয়াছি তাহা প্রথমে ভুলিতে হইবে, তবে জ্ঞান আহরণ করিতে পারিব। সুতরাং সখ করিয়া কে ভুল জানিতে চায়? কে ভুল জ্ঞান মনের কোণে জড়ো করিয়া রাখিতে চায়?

কিন্তু কোন্ ভাষা শুদ্ধ কোন্ ভাষা নয়, তাহা কে বলিয়া দিবে : ভাষা যে নিত্য পরিবর্তনশীলা ; বহতা নদীর মত বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সঞ্চরণশীলা ভাষা, জীবনের মত চঞ্চল গতির কল কল নাদে সদা মুখর, তাহার পটভূমি বদ্‌লাইতেছে, পটভূমির সঙ্গে সঙ্গে সেও নিত্য নবীভূত হইতেছে। জীবনকে আমরা ধরি ধরি, কিন্তু ধরিতে পারি কই! যখন তাহার নাগাল পাইলাম তখন আর সে জীবন থাকিল না,—তাহার গতিবেগ প্রহত হইয়া জাবনীশক্তিকে নস্যাৎ করিয়া দিল, মরণের মাঝেই জীবনকে ধরিতে পারি। ইহা হেঁয়ালি নয়, জীবনমরণের একটা স্থূল কথা, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধে বৈয়াকরণিক বলিয়াছেন বটে, "কুলা দিয়া ছাতু যেমন ঝাড়িয়া লওয়া হয়, ব্যাকরণ দিয়া ভাষাকে তেমন বাছিয়া লইতে পারি" : কিন্তু এ কথা শুধু সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধেই বলা চলে ; জীবিত ভাষার সম্বন্ধে এই নীতি অনুসরণীয় নহে।

ভাষার শুদ্ধি তবে কোথায়? কোথাও নাই কি? সাধুভাষা ও কথ্যভাষার মধ্যে এক দিন দ্বন্দ্ব ছিল কঠোর—আজ আর

তেমনটি নাই। কিন্তু সে দ্বন্দ্বের একেবারে অবসানও হয় নাই—বুঝি বা শীঘ্র অবসান হইবার নহে। আজকালও আমরা কথ্যভাষাকে সাধুভাষার সমান পঙ্‌ক্তিতে বসাইতে পারি নাই। পূর্বে যেমন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে পর্যন্ত দেখা যাইত,—*Render into chaste Bengali*—এখন ততটা বলিতে সম্ভবতঃ প্রশ্নকর্ত্তারও লজ্জা করে। অভিনয়মঞ্চে দাঁড়াইয়া অবশ্য একটু স্বচ্ছন্দে সাধারণ ভাষা প্রয়োগ করা যায়, যদিও তখনও সাধুভাষার প্রতি অনুরাগ একেবারে যায় না। গিরিশচন্দ্রের 'জনা'য় পড়ি—

দুর্গা কেবা? তারে নাহি জানি;
শুনি মায়ের সতিনী,
কি কারণে অর্চনা করিব ডাকিনীর?
শঙ্করে নাহিক মম ডর।
শিরে যারে ধরে গঙ্গাধর,
দুস্তরহারিণী দুরিতবারিণী
সুরতরঙ্গিণী সদয়া দাসীর প্রতি।

এ কথা স্বাভাবিক নহে, সচরাচর এ ভাষায় আমরা কথা বলি না, রাজবাড়ীতেও এই ভাবে সেকালে লোকে কথা বলিত কিনা সন্দেহ। বরং সাদাসিধা গদ্য অপেক্ষা ইহাকে সাজানো গোছানো হইয়াছে—বুঝিতে পারিতেছি। তথাপি এই জনা-নাটকেই বিদূষকের ভাষা, বিদূষকের সঙ্গে নীলধ্বজের কথা কহিবার ভাষা, গঙ্গারক্ষকদের ভাষা, নিতান্ত কথ্যভাষা। 'জনা' ১৩০০ বঙ্গাব্দে অভিনীত হয়। 'হারানিধি' ১২৯৬

সালে অভিনীত হয়; তবে উহা সামাজিক নাটক, তাই ইহাতে নিতান্তই কথ্যভাষা। চল্লিশ বৎসরেরও পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যখন সাধনা পত্রিকা প্রকাশিত করেন তখন তিনি কথ্যভাষা চালাইয়াছিলেন, যদিও গল্পগুচ্ছের ভাষা সাধারণ কথা কহিবার ভাষা নহে।

মোট কথা, কোনও সাহিত্যেই কথ্যভাষা কোনও দিন অচল ছিল, তাহা পাই না। বরং সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিল, এবং নাট্যশাস্ত্রকারগণ নাটকে কোন্ পাত্র বা পাত্রী কোন্ কোন্ ভাষা ব্যবহার করিবে, সে বিষয়ে পূর্ব হইতেই বিধান দিয়া রাখিতেন।

সাধুভাষা ও কথ্যভাষার প্রকৃত ও স্থায়ী বিরোধ থাকা দূরের কথা, সাধুভাষা বা সাহিত্যের ভাষা অনেক স্থলে কথ্যভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইতিহাস ইহার প্রমাণ দিয়াছে।

The dialect of the Isle de France has become the literary language of France owing to the accident that the Capets came to fix their capital at Paris. Umbrian, Oscan and Messapian gave place to Latin because the Roman Republic subdued the rest of Italy. Because Athens was the intellectual centre of the Hellenic world, because Castilian was spoken at Madrid, because Mahommed was born at Mecca, the local dialects of Athens, Castile and Mecca have become the

literary languages which we call Greek, Spanish and Arabic."

—The Evolution of Aryan Speech ;
(see Isaac Taylor's Origin of the Aryans—p. 251-98)

যদি তাহাই হয়, তবে বাংলার কোনও এক প্রদেশের বা অঞ্চলের ভাষা সাহিত্যের ভাষা হইয়া দাঁড়াইলে আপত্তির বা প্রতিকূল সমালোচনার কোনও কারণ—অন্ততঃ ঐতিহাসিক কারণ—দেখা যায় না।

আজকাল মাঝে মাঝে দেখি, প্রাদেশিক ভাষায় লিখিবার চেষ্টা। ঔপন্যাসিক উপন্যাস লিখিয়াছেন, সংগ্রহকার সংগ্রহ করিয়াছেন, কোনও বিশেষ গ্রামের বা বিশেষ জেলার ভাষায় ; কিন্তু ইহা সার্থক হয় নাই। কবিতায় ও গানে—অর্থাৎ যেখানে পাঠক বা শ্রোতাকে অল্পক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিতে হয়, ইহা কিছু পরিমাণে উপভোগ্য, কিন্তু দীর্ঘ রচনায় নহে। এ প্রকার প্রাদেশিকতা সর্বথা এবং সর্বদা বর্জনীয় ; তবে সকল প্রকার প্রাদেশিকতা নহে।

চল্‌তি কথা বা সাধুভাষা, কোন্‌টা চলিবে তাহা লইয়া বিচার বিদ্যালয়ের গণ্ডীতে অশোভন নহে ; কারণ ছাত্র আসিয়া প্রথমেই একথা জিজ্ঞাসা করিতেছে ও করিবে। বিদ্যালয়-পাঠ্য রচনাপুস্তকেও দেখিতে পাই—মন্তব্য করা হইয়াছে, "আজকাল শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির চেষ্টায় যে 'ব'লে,' 'ক'রে,' 'মোদ্দা কথা হচ্ছে' ইত্যাদির প্রচলন হইয়াছে তাহার

ব্যবহার না করাই কর্তব্য।” আবার একজন লিখিয়াছেন, “সাহিত্যের ভাষায় রাজধানীর এবং বীরবলী ঢং না চালানোই ভালো।” সেইজন্য ছাত্র যখন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে যে সে কোন্ ভাষায় রচনা লিখিবে, তখন তাহাকে উত্তর দিতে হইবে; উপেক্ষা করিলে চলিবে না। উগ্রমত উভয় পক্ষেই আছে; “মোপাসাঁর গল্প”—ফরাসী ভাষা হইতে কতকগুলি গল্পের বাংলায় অনুবাদ। অনুবাদের প্রথম কয়টি গল্প চল্‌তি ভাষায়, শেষের গল্পটি বইয়ের ভাষায় লেখা। ভূমিকায় যিনি পরিচয় বা মুখবন্ধ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে শেষের গল্পটি বইয়ের ভাষায় লেখা হইয়াছে বলিয়া ততটা ভাল হয় নাই! নিম্নলিখিত মন্তব্য সর্বান্তকরণে অনুমোদন করি—“বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে কলিকাতায়-চল্‌তি-ভাষার স্বত্ব সাব্যস্ত হইল, কিন্তু দখল আপাততঃ সাধুভাষারই থাকিবে। সাধুভাষাকে চল্‌তিভাষা উচ্ছেদ করিতে পারিবে না।”—এ বিষয়ে একটি মোকদ্দমার রায় এইরূপই পড়িয়াছিলাম!

কার্যতঃ আমরা দেখিতে পাই, উভয় ভাষায় মূলগত ভেদ ক্রিয়াপদ লইয়া। যেখানে পরিবেশ অনুকূল, সেখানে ‘চলতে’ ‘যেতে’ ইত্যাদি চলিতে পারে। উভয় ভাষায়ই ভালো বাংলা লেখা যায়, শক্তিশালী লেখক উভয় ভাষাতেই ভালো লিখিতে পারেন, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বামী বিবেকানন্দের ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ ও ‘বর্তমান ভারত।’ জড়তা যদি দূর করিতে হয়, তাহা হইলে চল্‌তি ভাষাকে খানিকটা আমল দিতেই হইবে—আর তাহা উপেক্ষা করিলে ভাষার সচল প্রবাহ

হইতে দূরে আসিয়া পড়িব ও শিক্ষার্থীর প্রকাশের শক্তিকে পঙ্গু করিয়া তুলিব। যাহা দেখা প্রয়োজন, তাহা হইল এই—উভয় ভাষা যেন না মিশিয়া যায়।

সাহিত্যের ভাষার উপর বিশেষ কোন dialect এর সতই প্রভাব থাকুক না কেন, সব dialect হইতেই অধিক পরিমাণে সে উপকরণাদি সংগ্রহ করে, কোন একটি প্রাদেশিকতা সে অনুসরণ করিয়া চলে না, যেখান হইতে যাহা লইবার যোগ্য, যাহা লইতে পারে, তাহা লইয়াই সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিকে আপন পথ করিয়াই সে চলিয়াছে। আর এইরূপে সাহিত্যের ভাষা পুষ্ট, সমৃদ্ধ, একটা বিশিষ্টতায় মণ্ডিত হইয়া উঠে—নলিনীগুপ্ত—বঙ্গভাষা ও বাংলা ভাষা,নারায়ণ, ১৩২৯।

১৭

অনুবাদের মত রচনার স্থানও প্রায় প্রত্যেক পরীক্ষায়, প্রত্যেক পাঠক্রমের মধ্যে আছে। কেন আছে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আমরা রচনা শিক্ষা দিয়া, প্রবন্ধ লিখিতে বলিয়া, ছাত্রদের নিকট হইতে কোন্ জিনিষটি চাই? আমরা যে কি চাই সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান স্পষ্ট হওয়া উচিত।

প্রবন্ধ লিখিতে গেলে একটু না ভাবিলে চলে না। ছাত্রের নিকট হইতে আমরা ইহাই চাই যে সে তাহার চিন্তাশীলতার

পরিচয় যেন দিতে পারে। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হইল মানুষকে চিন্তা করিতে সমর্থ করা, চিন্তা করিবার শক্তি যেন তাহার থাকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও বাড়া চাই; যাহা চিন্তা করিলাম, তাহা দশজনের সামনে প্রকাশ করিতে পারা চাই। আমরা হিমালয়ের গুহায় বসিয়া যদি শুধু ইচ্ছা করি, শুধু চিন্তা করি, তাহারও একটা মূল্য থাকিবে নিশ্চয়, তবে এখানে সেরূপ চিন্তার বা মূল্যের কথা বলি না।

প্রবন্ধ লিখিতে বলিলে অনেক সময় ছেলেমেয়েরা চট্ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করে; কেহ বা গড়গড় করিয়া দশ বার লাইন লিখিয়া তবে ভাবিতে আরম্ভ করে। কিন্তু রচনা লেখা হইল চিন্তাশক্তি বাড়াইবার জন্য; অন্ততঃ তাহাই রচনা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। সুতরাং বিষয়বস্তু সম্বন্ধে গোড়ায়ই কিছু ভাবিয়া লওয়া প্রয়োজন। প্রথম প্রথম ভাবিতে বসা একেবার যন্ত্রণাদায়ক; মোটেই ইচ্ছা করে না। তথাপি "যাহা আছে, বাড়ে চালনায়;" অভ্যাস করিলে মন ক্রমে এরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছে যে সহজেই চিন্তারাশি ভিড় করিয়া মনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। যাঁহারা পেশাদার লেখক অথবা সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁহাদের দ্রুত-রচনায় কুশলতা দেখিলে এই কথা যে সত্য তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়।

রচনায় কি লিখিব, এবং কতটা বাদ দিব, তাহাও দ্রুত স্থির করিয়া লইতে হইবে। শিক্ষার্থীকে অবিলম্বে বিচার করিতে হইবে, কতটা সময় তাহার হাতে আছে; যতটা তাহার

জানা আছে, তাহার হিসাবেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহাকে লিখিতে হইবে। সুতরাং আশু বিচার করিবার ক্ষমতা তাহার বাড়াইতে হইবে; এজন্য তাহার বুদ্ধিও স্থির হওয়া চাই।

প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া অনেক সময় দেখা যায় যে শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তুর জ্ঞান বড় অল্প; সেই জ্ঞান বাড়াইতে হইবে, বিদ্যা অর্জন করিতে হইবে। বিদ্যা ও বুদ্ধির সমবায় না হইলে ভাল প্রবন্ধ হইতে পারে না। যিনি বিদ্বান, তাঁহার বুদ্ধিও থাকা চাই, বিদ্যার ব্যবহার জানা চাই; আবার যিনি বুদ্ধিমান, তাঁহার পক্ষেও বিদ্যা অর্জন করা দরকার।

তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি যে প্রবন্ধ লেখার জন্য চাই চিন্তাশীলতা ও প্রকাশনৈপুণ্য; আশু বিচার ও স্থির বুদ্ধি; আমরা চাই বিদ্যা ও বুদ্ধির সমবায়। কি উপায়ে ছাত্রদের নিকট হইতে এই গুণগুলি পাওয়া যাইতে পারে?

চিন্তার অভ্যাস করানো দরকার। প্রথমে চিন্তা করিতে বলিলে বালক শিক্ষার্থী ছট্ ফট্ করিতে থাকিবে, মনঃসংযোগ করিতে পারিবে না। ক্রমে তাহার অভ্যাস হইবে। বিদ্যালয়ে নিত্য না হউক, নিয়মিত চিন্তার অভ্যাস করানো সম্ভব। সপ্তাহে একদিন দশ পনের মিনিট যদি ভাবিবার জন্য দেওয়া হয়; বাংলা রচনার জন্যই হউক আর অন্য কোন বিষয়েই হউক; এবং যদি সেই চিন্তার ফল তখনি কাগজে কলমে দেখিতে চাওয়া যায়, তাহা হইলে সুফল হওয়ারই সম্ভাবনা। কোন বিষয়ে চিন্তা করিব? বা চিন্তা করাইব? যথাসম্ভব

সকল বিষয়েই চিন্তা করানো প্রয়োজন। অবশ্য, যাহা জানা আছে তাহা লইয়াই বাল্যশ্রেণীতে রচনা শিখাইতে হইবে। অভ্যাস হইলে দেখা যাইবে, নিতান্ত বিশেষজ্ঞের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর বাহিরে সাধারণ সকল বিষয়েই বলিবার মত কথা সকলেরই আছে।

অনেক সময় দেখা যায়, চিন্তাকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনিতে হইলে কিছু কিছু সঙ্কেত দিতে হয়। এই সঙ্কেতগুলির সাহায্যে পুরাদস্তুর প্রবন্ধ লিখিতে বলা হইয়া থাকে। ইহাতে চিন্তার দিক দিয়া ছাত্রকে কিছু সাহায্য করা হইয়া থাকে; তবে ইহাতে একদিক দিয়া যেমন সাহায্য হয়, অন্যদিক দিয়া আবার ছাত্রকে বাঁধা-ধরা পথেও চলিতে হয়, তাহার মন ঠিক যেমনটি চায় তেমনই সে লিখিতে পারে না।

কি লিখিব, তাহা যখন পাওয়া গেল, তখন কি করিয়া লিখিব এই প্রশ্ন আসে। প্রকাশের নৈপুণ্য কি করিয়া আসিবে, তাহা লইয়াই যত ভাবনা। ভাষা শুদ্ধ হইবে, ইহা অবশ্য কাম্য; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে হইবে যেন তাহা সরসও হয়, অন্যের পড়িতে আগ্রহ জন্মে। নতুবা রচনার যত গুণই থাক, তাহার পিছনে যত শ্রমই থাক, তাহা অনেকটা নষ্ট হইয়া যাইবে। রচনা সংশোধনের সময় এই সরসতার উপর জোর দেওয়া উচিত।

শান্তিনিকেতন প্রেসে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত "আমাদের লেখা" হাতে পড়িল। পৃষ্ঠাঙ্ক নয়টি; লেখকসংখ্যা ষোল; তাহার মধ্যে দুইজন শুধু

লিখিয়াছে, "আমরা পরের বারে লিখিব।" অন্য লেখাগুলি পড়িলে বোঝা যায়, ছেলেমেয়েরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী, এবং সকলেরই বয়স বড় কম। তবু তাহাদের দুই চারিটি কথায় যেন তাহাদের সকল পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখা মানুষের ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তোলে। "আমাদের লেখা" পড়িয়া এই সত্য কথাটির অর্থ যেন আবার নূতন করিয়া বুঝিলাম। তৃতীয় শ্রেণীতে, কি তাহারও নীচে; শিশুবিভাগে এই ধরণের রচনা লেখানো যায়, তবে সাধারণ বিদ্যালয়ে তাহা মুদ্রিত করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, তাহা সম্ভবও নয়; বরং তাহা একত্র করিয়া অন্যান্য শ্রেণীতে পড়িয়া শোনাইলে ভাল হইতে পারে।

শুধু চিন্তা করা এবং চিন্তাকে শুদ্ধ ও সরস করিয়া প্রকাশ করিলেও চলিবে না; খানিকটা পড়াশুনাও থাকা চাই। কি পড়িব? শিক্ষক তাহার ইঙ্গিত করিতে পারেন। শিক্ষার্থীকেও সেজন্য শ্রম করিতে হইবে; হয়তো দশখানা বই ঘাঁটিয়া তবে একখানি বই রচনার কাজে লাগাইবার মত পাওয়া যাইতে পারে। আবার পড়িলেই হইল না; পঠিত বস্তুর আলোচনা চাই; আলোচনার মুখে অনেক নূতন কথা আসিতে পারে; যে সব কথা কখনও মনে আসে নাই, আলোচনার সময় সে সব কথা আসিয়া জোটে। এই জন্য তর্কসভা, কলেজের সেমিনার ইত্যাদি প্রয়োজন।

তাহার পর, যাহা জানা গেল তাহাকে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে হইবে। বিদ্যার পরিচয় দিতে হইলে জ্ঞাত বস্তুকে

সুবিন্যস্ত করিয়া রাখিতে বা দেখাইতে হয়; নতুবা পরিশ্রমের বা বিদ্যার পূর্ণমূল্য পাইতে পারা যায় না। আর লিখিতে বসিয়া যদি অবান্তর বস্তু বর্জন না করিতে পারি, তবে রচনা-প্রবন্ধ অযথা ভারাক্রান্ত হইবে। তাই একদিকে যেমন চাই বিদ্যার বিন্যাস, অন্যদিকে তেমনই চাই বিদ্যার বিনাশ।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহা শুধু বিদ্যালয়ের ছাত্রের জন্যই নহে, প্রবন্ধ রচনার প্রত্যেক স্তরেই ইহার উপযোগিতা বুঝিতে পারা যাইবে। রচনা সম্বন্ধে দুই চারিটি নিষেধের কথা মনে পড়িতেছে; তাহা এখানে দেওয়া হইল।

প্রথমতঃ মুখস্থ করিবে না। অনেকে এই মন্দ অভ্যাসের বশবর্তী হইয়া সমস্ত নষ্ট করেন। কোনও কোনও শিক্ষক মুখস্থ করিতে বলেন পর্যন্ত। কিন্তু রচনার পরিচয় যেখানে চাওয়া হয়, সেখানে নিজের রচনাই তো চাই, অন্যের রচনা দিয়া তো কাজ চলে না। সুতরাং রচনাসম্বন্ধীয় পুস্তকে যে সকল প্রবন্ধ থাকে, তাহারা আদর্শ স্বরূপ হইবে, তাহাদিগকে লইয়া বিচার আলোচনা করা যাইতে পারে, কিন্তু শুধু তাহাই লিখিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশা মনে মনে পোষণ করা সঙ্গত নহে।

দ্বিতীয়তঃ, সহসা লিখিতে বসা ভাল নয়। শিক্ষক যেন দেখেন যে ছাত্র লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে খানিকটা ভাবিয়া লয়। না ভাবিয়া লিখিলে তাহা এলোমেলো, বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে। তাই নিষেধ করিয়া দিতে হইবে,—সহসা লিখিতে বসিবে না।

তৃতীয়তঃ, পৌর্বাপর্য বজায় সম্বন্ধে ভুল না হয়; অর্থাৎ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে "লম্ফ প্রদান" সঙ্গত নয়। প্রবন্ধের মধ্যে খানিকটা আঁট সাঁট চাই, প্রত্যেক অনুচ্ছেদ তাহার পূর্বগামী ও পরবর্তী অনুচ্ছেদের সঙ্গে যুক্ত; এই যোগ যাহাতে ভাবে ও ভাষায় অক্ষুণ্ণ থাকে, শিক্ষার্থীকে সে বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে।

চতুর্থতঃ, অন্যের কথা দিয়া প্রবন্ধ পূর্ণ করিবে না। উদ্ধৃতি সম্বন্ধে অনেকের একটা দুর্বলতা দেখা যায়; যে সকল ভাল ভাল কথা তাহারা অন্যের রচনায় পড়িয়াছে যতক্ষণ তাহাকে নিজের রচনায় স্থান দিতে না পারিল ততক্ষণ তাহাদের তৃপ্তি নাই। এমনও দেখা গিয়াছে যে ছাত্র পরীক্ষার খাতায় গোটা প্রবন্ধই সাজাইয়াছে অন্যের উদ্ধৃতি দিয়া; তাহার নিজের লেখা তাহাতে কিছুই নাই। পরীক্ষার দিক হইতে এরূপ রচনার মূল্য খুব বেশি নহে। রচনায় শিক্ষার্থীর নিজের বুদ্ধি, বিদ্যা, রুচি ও প্রকাশের ক্ষমতা—এই সকলেরই পরিচয় আমরা চাহিয়া থাকি। সুতরাং এদিক দিয়া নিষেধের প্রয়োজন আছে।

বিদ্যালয়ে বিশেষ করিয়া দুইটি বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। রচনা আরম্ভ করিবার পূর্বে ছাত্রের কল্পনা ও বুদ্ধির বিকাশ সাধন করিতে হইবে। কি ভাবে তাহা সম্ভব? "চিত্রে রচনা শিক্ষা" আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। চিত্র দেখিয়া কল্পনা করিতে শেখানো ব্যবস্থা হিসাবে উত্তম, বিশেষ করিয়া শিশু ও বালক শ্রেণীতে।

চিত্রের মধ্য দিয়া গল্প উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে, কিছু প্রকাশ করিতেছে কিছু ঢাকিয়া রাখিয়াছে—ছাত্রের কাজ হইল, যাহা স্পষ্ট তাহার সাহায্যে যাহা অস্পষ্ট তাহাকে স্পষ্ট করা। শ্রেণীর অন্যান্য শিক্ষার্থীর চেষ্টা তাহার কল্পনা বিকাশে সাহায্য করিবে, সহজেই তাহার মধ্যে জন্মিবে নিজের উপর নির্ভরতা। এই আত্মবিশ্বাস তাহাকে রচনা করিবার সময় উৎসাহ দিবে, চিন্তা জোগাইবে, তাহার মুখে বাণী ফুটাইবে। কিন্তু শিক্ষককেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হইবে, কল্পনা-বিকাশে সাহায্য করিতে হইবে। শিক্ষক যদি এই অবস্থায় তাহার প্রেরণার মূলে না থাকেন, বা তাহার সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে না পারেন, তাহা হইলে ইংরেজি শিক্ষায় Direct method প্রয়োগ করিবার বেলায় শিক্ষকের অসাবধানতায় বা শক্তির অভাবে যেমন অনর্থ হয় কিছুদূর যাওয়ার পর আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না, চিত্রে রচনা শিখাইবার সময়ও তেমনই ঘটিবে। চিত্রে রচনা শিখাইতে গেলে শিক্ষকের পক্ষে চিত্র আঁকিতে পারা, সামান্য কয়েকটি রেখার সাহায্যে একটি ঘটনার আভাষ দিতে পারার শক্তি চাই। যিনি তাহা পারিবেন না, তাঁহার পক্ষে চিত্র সংগ্রহ করিয়া রচনা শেখানো সম্ভব বটে, কিন্তু প্রতিপদে তাঁহাতে বাধা পাইতে হইবে।

অন্য যে বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত, তাহা হইল এই। ছেলেদের মধ্যে কেহ কেহ লিখিতে পারে ভাল, কিন্তু বলিতে পারে না মোটেই ; আবার মুখে বলিতে দিলে অনেকে বলিতে

পারিবে বেশ, কিন্তু লিখিতে ভুল করিবে বিস্তর। বলিবার ও লিখিবার জড়তা ও সঙ্কোচ কাটাইয়া দিতে হইবে; সেজন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। অভ্যাস, বলিবার ও লিখিবার অভ্যাস করানোই ইহার প্রতিকার। বাল্য শ্রেণীতে বলাইবার ও কৈশোর শ্রেণীতে লিখাইবার অভ্যাস বেশি পরিমাণে করাইতে হইবে।

রচনার আরম্ভ কেমন হওয়া উচিত, তাহা সুলেখকদের রচনা হইতে বুঝিতে হইবে; এবং আরম্ভ যাহাতে ভাল হয় সেজন্য ছাত্রদের দিয়া চেষ্টা করাইতে হইবে। যে রচনার আরম্ভ ভাল, তাহা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই; মুগ্ধ হইলে তবে অগ্রসর হইয়া বাদবাকি পড়ি। রচনার শেষ অনুচ্ছেদটি দেখিয়াও অনেকে রচনার উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করেন; একটি প্রসঙ্গ যে শেষ হইল, ঐ শেষ অনুচ্ছেদটি পড়িয়া সে ধারণা যেন হয়। রচনার মধ্যবর্তী অংশ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইবে,—রচনাকৌশলের পরিচয় দিতে হইলে প্রথমে ও শেষে তাহার যতটা সুযোগ মিলিবে, অন্যত্র ততটা নয়।

রচনা কেমন হওয়া উচিত, সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নব্য লেখকদের প্রতি কি উপদেশ দিয়াছেন। রচনা শিখাইতে গিয়া সেই উপদেশগুলি একবার স্মরণ করা মন্দ নহে।

১৮

আমাদের হাতে সাহিত্যপাঠকে সরস করিয়া তুলিবার যে সকল সরঞ্জাম আছে, আমরা তাহা কাজে লাগাই না। শিক্ষককে দেখিতে হইবে, এরূপ সরঞ্জাম কোথায় কি আছে, এবং কোথায় কোনটা কাজে লাগিতে পারে তাহাও পরীক্ষা করিয়া স্থির করিতে হইবে।

এককালে প্রবাদবাক্য আমাদের দেশে লোকশিক্ষার সহায়তা করিয়াছে। আমাদের সমাজে ঠাকুরমা ও ঠাকুর-দাদা প্রভৃতির বুলি হইতে প্রবাদ-প্রবচন বাহির হইত; একালে কাহারও কাছে সে সব শুনিলে পুরাতন দিনের কথাই মনে পড়ে। 'অকালে না নোয় বাঁশ, বাঁশ করে টাঁস টাঁস'—'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়'—'অজার যুদ্ধে আঁটুনি সার'—'অবোলা বলে বড়' অফলা ফলে বড়'—'ঠাকুরে করিলে হেলা' রাখালে মারে ঢেলা'—'বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর'—কত নাম করিব? প্রত্যেকটি প্রবাদের পিছনে কত যুগের অভিজ্ঞতা আছে, তাহা কে বলিবে!

আমাদের বিদ্যালয়ে প্রবাদবাক্য লইয়া বিশেষ পাঠের কোনও আয়োজন নাই। স্বতন্ত্র পাঠের প্রয়োজন নাই, তবে কোনও প্রসঙ্গে সুবিধামত আমরা প্রবাদবাক্যের সাহায্যে পাঠ সরস করিয়া তুলিতে পারি। ইহাতে ছাত্র বিষয়টি সহজে ও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে, কারণ প্রবাদের ধরণই এমন যে লোকের মনে থাকিয়া যায়।

বহু প্রবাদ একত্র পাওয়া যায় সুবলমিত্রের সরল বাঙ্গলা অভিধানের পঞ্চম ভাগে (ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৯—১৫৪০ পৃঃ)। ইহা ভিন্ন অন্য প্রবাদ-সংগ্রহ এখন আর সহজলভ্য নহে।

প্রবাদ পড়াইবার সময় প্রয়োগ করিতে করিতে উহা সংগ্রহের কথা উঠিতে পারে ; সংগ্রহ করা ভাল, তবে কঠিন। দুই কারণে কঠিন,—এক, কাহার নিকট সংগ্রহ করিবে ? যাহারা প্রবাদ জানিতেন ও প্রয়োগ করিতেন তাঁহাদের যুগ গত হইয়াছে। এখনকার বর্ষীয়সী মহিলাদের মধ্যে প্রবাদ বা প্রবচন প্রয়োগ করিবার রীতি অনেক কমিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কে সংগ্রহ করিবে ? শিক্ষকের যদি এদিকে দৃষ্টি থাকে, অর্থাৎ তিনি নিজে যদি চেষ্টা করেন, ও ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যে যদি চেষ্টা করেন, তবে কিছু না কিছু ফল অবশ্য হইবে। তবে সাহিত্য-পরিষৎ প্রভৃতি বড় বড় প্রতিষ্ঠান যে কার্যে অপারগ, বা বেশি কিছু করিতে পারে নাই, বিদ্যালয়ের বালকবালিকারা তাহা কতদূর পারিবে ? সমবায়-বিহীন শিক্ষকদের ব্যক্তিগত চেষ্টার উপর এ কাজের ভার ফেলিয়া দিলে সুফল কি পাওয়া যাইবে ? যদি বিনা আয়াসে এরূপ সংগ্রহ সম্ভবে, তবে অবশ্য আপত্তি নাই, বরং ভালই ; কিন্তু আমরা ভাল কাজ, অর্থাৎ সংগ্রহের কাজ ভালমত হইবে, ইহাই বা আশা করি কি করিয়া ? এরূপ আশা করিবার যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণই নাই ! সুতরাং অল্পেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

যদি প্রবাদবাক্য সাহিত্যশিক্ষার পক্ষে অনুকূল হয়, অথচ প্রবাদসংগ্রহ যদি কঠিন হয়, তাহা হইলে আর একদিকে চেষ্টা

চলিতে পারে কি না বিবেচ্য,—প্রবাদ প্রস্তুত করা যায় কি? প্রবাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে উহা অতি সংক্ষিপ্ত উক্তি। ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া বলিলে প্রবাদ হয় না, লোকযাত্রা সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতার জমাট বর্ণনাই হইল প্রবাদ। দ্বিতীয়তঃ, প্রবাদের মধ্যে ছন্দের একটা আভাষ পাওয়া যায়। 'বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর'—'ঘর' ও ধর', এই দুইয়ে মিল পাওয়া যায়। মিল যেখানে নাই, সেখানেও ছন্দ নিজেই নিজেকে দোলা দিতেছে। তৃতীয়তঃ, প্রবাদে সাধারণ সত্য কথারই জ্ঞান জন্মিবে, এবং তাহা হইবে অভিজ্ঞতার কথা। চতুর্থতঃ, এই সত্যকে প্রবাদ image বা বস্তুজগতের ছবির সাহায্যে প্রকাশ করিবে। ছাত্রদের সাহায্যেই হউক আর নিজেই হউক, শিক্ষক এরূপ প্রবাদ অর্থাৎ এরূপ লক্ষণাক্রান্ত বাক্য কেনই বা না প্রকাশ করিতে পারিবেন? বাক্য বলিবার ভঙ্গী বা রূপের প্রতিও ছাত্রদের দৃষ্টি এইভাবে আকর্ষণ করিতে পারা যাইবে; ইহা কম লাভ নহে।

প্রবাদ বাক্য নির্মাণ করিতে আমরা ভয়ই বা পাই কেন উহা তো চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অনেক সময় দেখা যায়, বড় বড় কবিরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও প্রবাদের আকার ধারণ করিয়াছে। যেমন ভারতচন্দ্রের কথায়,—

যে কহে বিস্তর মিছা কহে সে বিস্তর।

কবিবাণী আমরাও এরূপে প্রয়োগ করিতে পারি। এরূপ

প্রবাদ লোকের মুখে মুখে না পাইলে তাঁহাদের রচনার মধ্যে ধরিতে পারা যায়।

প্রবাদবাক্য বিস্তার কিন্তু অন্য ধরণের কাজ। রচনা লিখিতে গিয়া যাহা প্রয়োজন, প্রবাদবাক্য বিস্তার করিতেও তাহারই প্রয়োজন। তথাপি রচনার রকমফের বলিয়া উহাকে আমরা গ্রহণ করি ও গ্রহণ করিয়া বিস্তৃত করি। ছাত্রদের মাঝে মাঝে প্রবাদবাক্য বিস্তার করিতে দেওয়া উচিত।

১৯

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়িতে গেলে আমাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান লইয়াও আমরা খানিকটা রস গ্রহণ করিতে পারি; কিন্তু পড়াইতে গেলে ক্রমেই অন্যান্য নানা গুণের প্রয়োজন হয়। শিক্ষকের ছাত্রকে সর্বদা সাক্ষাৎভাবে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নাই, তিনি থাকিবেন ছাত্রের পথপ্রদর্শক হিসাবে, তবে নানারূপ আনুষঙ্গিক জ্ঞান তাঁহার থাকা চাই। সাহিত্যের ইতিহাস, তাহার ভাবধারা, ইতিহাসের দৃষ্টিতে তাহার পরিবর্তন—এ সকলের জ্ঞানও তাঁহার চাই। শিক্ষকদের নিকটে কত জিনিষ যে চাই, তাহার অন্ত নাই; যখন বলি যে সাহিত্যের ঐতিহাসিক জ্ঞান তাহার অন্যতম,—তখন শিক্ষকেরা বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করিতে পারেন, আবার সাহিত্যের ইতিহাস জানা চাই কেন? আমরা কি গবেষণা করিতে যাইতেছি?

বাস্তবিক, তাঁহারা যদি এরূপ প্রশ্ন করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে খুব দোষ দেওয়া চলে না। জ্ঞানের সীমা নাই, যত জানা যায় ততই ভাল; তব আমাদের এপারের জীবন

যখন সীমাবদ্ধ, তাহার যেমন একটা শেষ আছে, তখন কোন সময়ে কতখানি জানার জন্য চেষ্টা করিব তাহার একটা হিসাব করিতে হয়। শিক্ষক যখন হইয়াছি, তখন শিক্ষকতার উৎকর্ষের জন্য, বৃত্তি যাহাতে সুসম্পন্ন হয় তাহার জন্য খানিকটা পরিশ্রম করিতে রাজি আছি। কিন্তু বিশেষ করিয়া সাহিত্যের ইতিহাস জানিতে হইবে কেন? ইংরেজি যাহারা পড়ান তাঁহারা কি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করেন, অন্ততঃ তাঁহাদের জন্য সেইরূপ আলোচনার ব্যবস্থা আছে কি?

সাহিত্যের ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় থাকা যে চাই, সেকথা বলিলে শিক্ষকগণ উপরে যেমন লিখিয়াছি তেমন আপত্তি উত্থাপন করিবেন। কথাটা একটু ভাবিয়া দেখা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ও পাঠ্য হিসাবে নির্দিষ্ট সঙ্কলন পুস্তক হইতে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা—ধরা যাক, 'মানী' বা 'স্পর্শমণি' আমরা বিদ্যালয়ে পড়াইলাম, শুধু ঐ কবিতার ভাব লইয়া আলোচনা করিতে পারি। যাহারা ছাত্রদের আরও একটু জ্ঞানী করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহারা হয়তো রবীন্দ্র-নাথের কথাও কিছু বলিলেন। কাহার লেখা তাহা না জানিলে শুধু ঐ কবিতার যে ভাব হইত, রবীন্দ্রনাথের লেখা জানিয়া তাহার অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্রভাবে কবিতাটিকে গ্রহণ করিলাম। উক্ত কবিতাটির রূপ যেমন, অন্য কবিতার সঙ্গে উহার রূপগত যে মিল, তাহার দিক দিয়া কবিতাটি পড়িলাম। রসবোধ অন্যরূপ হইল। আবার উনবিংশ শতাব্দীর

কাব্য হিসাবে উহার মূল্য স্বতন্ত্র। কাব্য, কাব্যরূপ, কবি, যুগসাহিত্য, সমগ্রসাহিত্য,—আমাদের দৃষ্টিভূমি যেমন যেমন বিস্তৃত হইবে, কাব্যের আস্বাদও তেমন তেমন গাঢ় হইবে। কাব্য, প্রবন্ধ, গদ্যবর্ণনা—সাহিত্যের, যাহাই পড়ি না কেন, তাহার গভীর আস্বাদ পাইতে হইলে দৃষ্টিভূমি প্রসারিত করিতে হইবে, সাহিত্যের ধারার দিক হইতে তাহা বুঝিতে হইবে, তবে তাহা পূর্ণ দৃষ্টি হইবে।

আমাদের সাহিত্যসংগ্রহে—সর্বোচ্চ চারি শ্রেণীতে সংগ্রহই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে—বৈষ্ণব মহাজনদের পদ আছে, কবিকঙ্কণের উপাখ্যান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, দাশুরায়ের পাঁচালী, এ সকল হইতে কিছু কিছু লওয়া হইয়াছে, রবীন্দ্র-নাথের কবিতা, আধুনিক লেখকদের রচনা, সব রকমেরই রচনা আছে। এসকলের জ্ঞান যদি নিতান্ত খাপছাড়া হইতে না হয়, যদি ইহাদের মধ্যে একটা যোগসূত্র বাহির করিতে হয় তবে ঐতিহাসিক জ্ঞানের একটা ভিত্তি এই সময়েই স্থাপন করিতে হইবে।

যাহা খণ্ডশঃ দেখি তাহা সংহতরূপে দেখিতে ও দেখাইতে চেষ্টা করা চাই, জ্ঞানের চর্চা এই দিক দিয়াও করিতে হয়। সাহিত্যের বিভিন্নরূপে বিভিন্নভাবে বিভিন্নকালে যে মূর্তি দেখা যায়, সাহিত্যশিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হইল সেই মূর্তির সাক্ষাৎ লাভ করা। অবশ্য ইহা গৌণ উদ্দেশ্য,—মুখ্য উদ্দেশ্য ইহা নয়, অন্ততঃ বিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় নয়, তথাপি গৌণ উদ্দেশ্য হইলেও তাহা শিক্ষকের সামনে রাখিতে হইবে।

বিশেষ করিয়া যাহারা পরবর্তীকালে সাহিত্যে উচ্চশিক্ষা পাইতে চাহে, তাহাদের পক্ষে এই সময়ে সেই শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করা উচিত। পরবর্তী কালে শুধু মুখস্থ করিয়া নাম-গুলি মনে রাখাও কঠিন, তখন সেরূপভাবে সাহিত্যের ইতিহাস মনে রাখা অতি নীরস কার্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রেরা উচ্চ শ্রেণীতে সাহিত্য শিখিতে গিয়া এইখানে আসিয়া ঠেকে। বিদ্যালয়ে কথাচ্ছলে সাহিত্যের ইতিহাস বা ধারা বুঝাইয়া দিলে, এই সাধারণ জ্ঞান ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার্থীর কাজে লাগিবে।

অনেক ইংরেজি বিদ্যালয়ে দেখিয়াছি, সর্বোচ্চশ্রেণী দুইটিতে ইংরেজি সাহিত্যের কথা অবশ্যপাঠ্য; কোনও বিদ্যালয়ে হয়তো প্রথমশ্রেণী বাদ দিয়া—বোধ হয় তখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয় বলিয়া—দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরেজি সাহিত্যের কথা রীতিমত পাঠ্যপুস্তক অবলম্বনে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেরূপভাবে বাংলাসাহিত্য পড়ানো আমাদের বিদ্যালয়ে এখনও সম্ভব হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষকদের চর্চা থাকিলে তাঁহারা সুবিধামত বিষয়ান্তরপ্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতার দিক ছাত্রদের বুঝাইয়া দিতে পারেন।

যাহারা শুধু বর্তমান বাংলা সাহিত্যই পড়ে, তাহাদের পক্ষে পুরাতন বাংলার ভাব ও রূপ ধরিতে অসুবিধা ও কষ্ট হওয়ার কথা। সেকালের লোকেরা যে ভাবে সাহিত্যকে দেখিতেন আমরা কিন্তু সে ভাবে দেখি না, তাঁহাদের নিকট সাহিত্য ছিল ধর্মের উপকরণ, ধর্মকথা বলিবার জন্য সাহিত্য,

আমাদের নিকট ধর্ম ও সাহিত্যের যোগ অত স্থূল নহে। সেকালে অনুপ্রাস লইয়া লোকে বাস্তবিকই আনন্দ করিত, ভারতচন্দ্র যখন লিখিলেন,

আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥

আবার, দুইপণে এক পণ কিনিয়াছি পান।
আমি সেই তেই পান্থ অন্যে নাহি পান॥

তখন যাহারা সে কথা শুনিল তাহারা মুগ্ধ হইয়া গেল। একালে অনেক কথা বলিয়াও কোন ভাব বোঝানো যায় না, সেকালে অল্প কথাও লোকে মনে করিয়া রাখিত, কারণ এখনকার তুলনায় তখন লেখাও কম হইত, আবার তাহার প্রচারও হইত সীমাবদ্ধ। তাই লোকে যাহা কানে শুনিত তাহা মন দিয়াই শুনিত, যাহারা পুঁথি লিখিতেন তাঁহারাও সে কথা জানিতেন বলিয়া বাহুল্য করিতেন না। গদ্য রচনা এখন সাধারণ রীতি, তখনকার দিনে গদ্যের এই আসন ছিল না। সাহিত্যের বৈচিত্র্য ছিল স্বল্প, তাহার রূপ ছিল সঙ্কীর্ণ। সেইজন্য তখনকার সাহিত্যের একটা স্পষ্ট ও মোটামুটি ধারণা এখনকার শিক্ষকদের থাকা বিশেষ প্রয়োজন। নতুবা বিদ্যালয়ে পড়াইতে গিয়া তখনকার সাহিত্যের প্রতি তাঁহারা সুবিচার করিতে পারিবেন না।

আমাদের সাহিত্যের বয়স হাজার বৎসর। এই হাজার বৎসরের মধ্য দিয়া সে চলিয়াছে নানা পথে, নানা রূপে, নানা ভাববৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া। আমাদের ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের

সীমার মধ্যে থাকিয়াও কি সমগ্র বাংলাসাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিতে শিখিয়াছে ? কি করিয়া তাহাদের মনে শ্রদ্ধা জাগিবে, যদি না শিক্ষকেরা তাহার সহিত তাহাদের পরিচয় স্থাপন করিয়া দেন ? যখন কিশোর ছাত্র শুনিবে—

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল

কায়া হইল তরুবরবিশেষ ; তাহার পাঁচটি শাখা ; চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করিল।

তখন তাহার গভীর অর্থ সে যদি না বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তো প্রাচীন সাহিত্যে তাহার শ্রদ্ধা হইবে না। এইরূপ আত্মীয়তা বোধ যাহাতে জাগাইতে পারেন, সেজন্যও বাংলা-সাহিত্যের ধারাবাহিকতার জ্ঞান থাকা শিক্ষকের পক্ষে প্রয়োজন। কৃত্তিবাস ওঝার 'ভরতমিলন' পড়িয়া কাহারও সহজে ভাল লাগিবার কথা নয়, বিশেষ করিয়া যদি হেমচন্দ্রের 'যমুনাতটে' পড়িয়া বা কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' পড়িয়া তাহাদের কথাগুলি, ভাবমাধুর্য ও ছন্দের ঝঙ্কার, তাহার কাণে বাজিতে থাকে। শিক্ষককে কবিতাগুলির তারতম্য বুঝিতে হইবে, সময়ের মাপ কাঠিতে; তবেই না ছাত্রও—

রত্ন সিংহাসনেতে ভরত পাট পাতি
তদুপরি পাদুকা রাখিয়া ধরে ছাতি ॥
তার নীচে শ্রীভরত কৃষ্ণসারচর্মে
পাত্র মিত্র সহিত থাকেন রাজকর্মে।

ইহার অর্থ বুঝিতে পারিবে।

. সাহিত্যের পরিবর্তনের ইতিহাস, তাহার ধারাবাহিকতা, তাহার সংহতির কথা শিক্ষককে জানিতে হইবে, জানিলে তাঁহার শিক্ষাদান আরও ভালভাবে হইবে।

২০

বিদ্যালয়ে নিত্য যাহা পড়াইতে হইবে, তাহার জন্য নিত্য প্রস্তুত হওয়া চাই। একবার পড়িয়া রাখিলে চলিবে না; যত্ন করিয়া পড়িয়া রাখিলেও সব সময়ে মনে থাকে না। পড়াইতে যাওয়ার পূর্বে পড়াইবার বস্তু দেখা, ভাব ও গুছাইয়া লওয়া চাই। অনেক সুশিক্ষকের মুখে শুনিয়াছি, 'আমি প্রস্তুত হইয়া আসি নাই, আজ পড়াইতে পারিব না।' সঙ্কটে পড়িলে তাঁহারা অবশ্য কাজ চালাইয়া লইতে পারেন, কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহারা পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া আসাই পছন্দ করেন।

এই প্রস্তুত হইয়া আসার জন্য একটা ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। শিক্ষক যেদিন যাহা পড়াইবেন, সেদিন তাঁহার যেন সে বিষয়ে কাগজে কলমে কিছু লেখা থাকে। এরূপ ব্যবস্থার পরিচয় পরিদর্শকেরা তো চাহিতেই পারেন, তাহা ভিন্ন যিনি প্রধান শিক্ষক, বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের প্রধান দায়িত্ব যাঁহার উপর, তিনিও চাহিতে পারেন। প্রতিদিনের কাজ যদি পূর্ব হইতে হিসাব করা যায়, যদি সেই হিসাবের অনুযায়ী পড়ানো

হয়, তবে শিক্ষকের কৃতিত্ব বাড়িতে থাকে, তাঁহার শিক্ষাদান এলোমেলো না হইয়া সুনির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে চালিত হয়; ফলে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই লাভ।

পাঠসঙ্কেত লিখিতে হইবে; কিন্তু কোন্ প্রণালীতে? প্রণালীর তিনটি সোপান বা পাঁচটি সোপান আছে। প্রথমতঃ যাহা পড়ানো হইবে তাহা ছাত্রেরা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত কিনা তাহা দেখিতে হইবে। প্রশ্ন করিয়াই হউক আর বলিয়া দিয়াই হউক, তাহাদের সম্মুখে যাহা পড়ানো হইবে তাহা গ্রহণ করিবার মত ধারণা আনিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যাহা পড়ানো হইবে তাহার বিষয়, ভাব ও বর্ণনাভঙ্গীর দিক দিয়া তাহা পড়ানো। তৃতীয়তঃ, যাহা পড়ানো হইল তাহার বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ছাত্রদের জ্ঞান পরীক্ষা করা এবং তাহাদের পঠিত বিদ্যার অনুশীলন জন্য বাড়ীতে কাজ দেওয়া। এই বিভিন্ন ক্রমের নাম কেহ কেহ রাখিয়াছেন সোপান, কেহ কেহ বা নাম দিয়াছেন, পর্যায়।

শিক্ষাবিদ্ হার্বার্টের কাছে এই তিনটি সোপান হইয়া দাঁড়াইয়াছে পঞ্চসোপান প্রণালী। প্রথম সোপান হইল, প্রস্তুতকরণ; ছাত্রদিগকে প্রস্তুত করা হইল একটা আবশ্যক কাজ। তামাদের পূর্বলিখিত দ্বিতীয় সোপানকে ভাঙ্গিয়া হার্বার্ট করিয়াছেন তিনটি—উপস্থাপন বা বিষয়-বিভাগ, বিষয় সম্মেলন বা পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের সঙ্গে নূতন বিষয়ের সম্বন্ধ-নির্ণয়, সাধারণ সূত্র নির্ধারণ বা যাহা জানা গেল তাহাকে সাধারণ ভাষায়—যে ভাষা সকলের ক্ষেত্রে খাটে এমন ভাষায়—

প্রকাশ করা। আমাদের পূর্বলিখিত তৃতীয় সোপানই হইল হার্বাটের পঞ্চম সোপান বা প্রয়োগ।

শিক্ষকেরা কেহ কেহ এরূপ পাঠসঙ্কেতের অভ্যাসকে ভাল চক্ষে দেখেন। অধিকাংশ শিক্ষকই কিন্তু ইহার মধ্যে কিছু ভাল দেখিতে পান না। কিন্তু নিয়মানুবর্তিতা, পাঠ্যবিষয়ে সতর্কতা, পূর্ব হইতে প্রস্তুত থাকার অভ্যাস—কোন্‌টি মন্দ? সত্য বটে যে পড়াইতে গিয়া অনেকে সঙ্কেত বা পূর্ব সিদ্ধান্ত মত পড়াইতে পারেন না, এবং সেরূপ না পড়াইয়াই বরং পড়ানো আরও সজীব করিয়া তোলেন। অবশ্য তাঁহাদের পড়ানোকে পূর্বলিখিত সঙ্কেত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়। কেহ চাহেন না যে শিক্ষক কোনও নিয়ম বা প্রণালীর অনুরোধে নিজের পড়ানোর ক্ষমতাকে খর্ব করিয়া ফেলেন। কিন্তু সেখানেও এই কথা বলিব যে পড়ানো ও পাঠসঙ্কেত করা, এই দুইয়ের মধ্যে সাম্য হয় নাই; সঙ্কেত প্রস্তুত করিবার ক্ষমতাকে আরও বাড়াইতে হইবে। পাঠসঙ্কেত প্রস্তুত করার গৌণ ফল হইল এই যে, কি পড়াইব এবং কাহাদের পড়াইব, তাহা লইয়া পূর্বে একটু ভাবিতে হয়; কেমন করিয়া পড়াইব, যাহাদের পড়াইব, তাহাদের পূর্বজ্ঞানের সহিত নূতন জ্ঞানের সমন্বয় কেমন করিয়া করিব, তাহার দিকে একটু মন দিতে হয়।

কি পড়াইব, কোন শ্রেণীতে পড়াইব, এমন কি সেই শ্রেণীতে কতজন ছাত্র, কতখানি সময়ের মধ্যে পড়াইব, এবং তখনকার মত বিশেষ উদ্দেশ্য কি,—এই সকল পূর্ব হইতে

নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে। শেষোক্ত বিষয়টি, অর্থাৎ বিশেষ পাঠটি পড়াইবার উদ্দেশ্য, স্পষ্ট করিয়া লেখা দরকার। শুধু রসাস্বাদ কিংবা পাঠ শিক্ষা বলিলে চলিবে না; পাঠের বিষয় সম্বন্ধেও ইঙ্গিত চাই, কারণ কোন পথে রসাস্বাদ, পাঠে কি শিক্ষা লাভ হইতে পারে, তাহার কথাও পাঠসঙ্কেতে দিতে হইবে। পাঠসঙ্কেতের পরিভাষা আমাদের এখনও সহজ হয় নাই, সুতরাং আমাদের পরিভাষায় যাহা কিছু অসম্পূর্ণতা আছে তাহা এখন একেবারে দূর হইবে না, তথাপি স্পষ্টতার দিকে মন দিলে সময়ে সকলই সহজ হইবে।

যাহারা বিদ্যালয়ে পড়াইবার জন্য শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের রচিত পাঠসঙ্কেত তিনটি সংগ্রহ করিয়া নীচে প্রকাশিত করিলাম। কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ইহাদের ধরণে অন্যান্য পাঠসঙ্কেত রচিত হইতে পারিবে। তৃতীয় পাঠসঙ্কেতটী শেষের দিকে পূরাপূরি দেওয়া হইল না। ইহা আরও অনেক বড় করিয়া লেখা যাইতে পারে, এবং এইভাবে পাঠ প্রস্তুত করাই পূর্ব্বে রীতি ছিল, এখনও একেবারে উঠিয়া যায় নাই। তবে ইহার পরিভাষা যথাসম্ভব বাংলা করিয়া দিলাম: বাংলার পরিভাষা বাংলা হওয়াই উচিত।

[১]

শিক্ষক—

স্কুল—

শ্রেণী—চতুর্থ বিষয় ঃ—বাংলা কবিতা

তারিখ— 'মাতৃভক্তি'

সময়— শ্রীকালিদাস রায়।

উদ্দেশ্য—

সম্পূর্ণ আবৃত্তিভঙ্গীকে আশ্রয় করে, প্রধানতঃ ধ্বনি ও ছন্দের সাহায্যে, কবিতাটির বিশিষ্ট নাটকীয় রসকে ছাত্রদের চিত্তে সঞ্চারিত করে দিতে হবে। দস্যুদের মধ্যেও মহত্ত্বের বিকাশ দেখা যায়, এই তত্ত্বটির প্রতি পাঠোদ্যমকে ইঙ্গিতে পরিচালিত করা প্রয়োজন।

প্রথম পর্যায়—

"ডাকাতের গল্প নিশ্চয় তোমাদের ভাল লাগে। আজ তোমাদের একটা ডাকাতের গল্প বল্‌ব।" এই ভাবে পাঠের সূচনা। অল্প দুইচারি কথায় বিশে ডাকাত রবিন হুডের গল্প করা।

"আচ্ছা, ডাকাতেরা সবই তো খারাপ লোক নয়?"

ছাত্রদের উত্তর—অন্য ডাকাত ভাল ডাকাত—"বেশ, আজকে তোমরা ডাকাতদের যে গল্প শুনবে তাদের মধ্যে কোন ভাললোকছিল কিনা, তোমরা আমায় তা ভেবে বলবে।"—এইরূপে পাঠের আয়োজন।

এইখানে ছাত্রদের প্রশ্ন করে 'শাস্তিপত্রী' কথাটির তাৎপর্য পরিষ্কার করে নেওয়া হবে; তারপর মূল পাঠের অবতারণা।

দ্বিতীয় পর্যায়—

১। শিক্ষকের প্রাথমিক পাঠ। প্রধানতঃ পাঠের সাহায্যে কবিতাটির অর্থ যথাসম্ভব পরিস্ফুট করে তোলা হবে।

২। শিক্ষকের দ্বিতীয়বার পাঠের প্রসঙ্গে স্বল্পব্যাখ্যা।

দুইটি ছাত্রকে আহ্বান করে 'শাস্তিপত্রী'র ব্যাপারটি বুঝিয়ে দেওয়া, এবং দুই দস্যুর কথোপকথনকে নাটকের আকার দেওয়া হবে।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি অর্থসমেত ব্ল্যাক-বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে। ছাত্রেরা সেগুলির সাহায্যে কবিতাটির অর্থ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করবে মাত্র. সুতরাং সেগুলিকে তাদের লিখে নেবার প্রয়োজন নেই :—

তলবে—ডাকে। দণ্ডবিধান—শাস্তিদান। নির্বিচারে—বিনা বিচারে। চরম-বাণী—শেষ কথা। আশ্বাস—প্রবোধ। ভরসা—আশা। কশা—বেত।

৩। ছাত্রেরা পৃথক ভাবে কবিতাটি পড়বে। তাদের পাঠে আবৃত্তি ভঙ্গীকে পরিস্ফুট করতে সাহায্য করা হবে।

৪। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির দ্বারা কবিতাটির আখ্যান-ভাগের পুনরাবৃত্তি করা হবে—

এই কবিতাটিতে কজন ডাকাতের কথা তোমরা পড়লে? তাদের কাকে কী শাস্তি দেওয়া হয়েছিল? যার মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল সে কী বলল? যার কশাদণ্ড হয়েছিল সে কী বলল?

তৃতীয় পর্যায়—

কবিতাটির মর্ম এবং রস ছাত্রেরা কতদূর গ্রহণ করেছে, নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সাহায্যে তা পরীক্ষা করা হবে।

১। এখন বলো, ডাকাতদের মধ্যে ভাল লোক আছে কিনা ? যাদের কথা শুনলে তাদের মধ্যে কে ভাল ? কেন তাকে ভাল বলছ ?

২। ঐ দুজন ডাকাতের মধ্যে কাকে তোমার বেশি ভাল লাগে ?

৩। ডাকাতের এই গল্পটী ছোট করে বলতো।

৪। এই কবিতাটির একটা ভাল নাম কী দেওয়া যেতে পারে ?

[২]

পঞ্চম শ্রেণী তারিখ—

সময়—৩৫ মিনিট

বিষয় : বাংলা ব্যাকরণ ছাত্রসংখ্যা—৩০

বিষয়বস্তু : সমাস প্রকরণ

উদ্দেশ্য : সমাসের প্রাথমিক জ্ঞান লাভে ছাত্রীদের সাহায্য করা।

প্রথম সোপান

১। নিম্নলিখিত বাক্যটি বোর্ডে লিখিয়া চিহ্নিত পদগুলি কি ভাবে, এবং কোন নিয়মানুযায়ী পৃথক করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে ছাত্রদের প্রশ্ন করা হইবে।

উত্তমর্ণের অভিযোগে মহেশ কারাগারে নীত হইল।

২। মেঘনাদবধ কাব্যের নিম্নলিখিত চারটি লাইন বোর্ডে লিখিয়া উহা কোন কবির কোন কাব্য হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে ছাত্রদের তাহা প্রশ্ন করা হইবে, এবং তাহারা বলিতে অক্ষম হইলে বলিয়া দেওয়া হইবে।

পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি ? সতত স্বপনে
শুনিতাম বনবীণা বনদেবী করে।

পঞ্চবটী, গোদাবরী-তটে, কান্তার-কান্তি, বনবীণা ও বনদেবী, পদগুলি কি উপায়ে পৃথক করা যাইতে পারে, এবং উহা সন্ধির নিয়মে সংক্ষেপ করা হইয়াছে কিনা, তাহা প্রশ্ন করা হইবে। প্রশ্নোত্তর গ্রহণ করিয়া পদের সংক্ষিপ্তকরণের এই নূতন ধারাকে যে সমাস বলা হয়, শিক্ষক তাহা বলিয়া দিবেন।

দ্বিতীয় সোপান

নিম্নলিখিত শব্দগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ করিতে বলিয়া ছাত্র-প্রদত্ত উত্তর বোর্ডে লিখিবেন।

উত্তমর্ণ = উত্তম + ঋণ
নয়ন = নে + অন
দুরাশা = দুর + আশা
অত্যুচ্চ = অতি + উচ্চ

নিম্নলিখিত সমাসের উদাহরণ দিয়া শিক্ষক সন্ধি ও সমাসের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য কি, ছাত্রদের প্রশ্ন করিবেন, এবং তাহারা বলিতে অক্ষম হইলে তিনি উহাদের সহিত আলোচনা করিয়া বলিয়া দিবেন।

দোয়াত-কলম	=	দোয়াত ও কলম
গুরু-শিষ্য	=	গুরু ও শিষ্য
শস্য-শ্যামলা	=	শস্য দ্বারা শ্যামলা
পঞ্চবটী	=	পঞ্চ বট যেখানে সেই স্থানে
গোদাবরীতট	=	গোদাবরীর তট
বীণাপাণি	=	বীণা পাণিতে যাঁহার তিনি
অশ্বরথপদাতি	=	অশ্ব, রথ ও পদাতি

শিক্ষক ছাত্রদের সহিত আলোচনা করিয়া বোর্ডে সংক্ষিপ্তসার লিখিবেন :—

১। একাধিক পদকে সংক্ষেপে এক পদে প্রকাশ করার নাম সমাস।

২। সন্ধি ও সমাস উভয়ই বড়কে সংক্ষেপ করে।

৩। সন্ধিতে ধ্বনির পরিবর্তন হয়।

৪। সমাসে একাধিক পদের একপদ হয়।

৫। একাধিক পদের সমাস করিয়া যে একপদ হয় তাহাকে সমস্ত পদ বলে।

৬। সমাসের ব্যাখ্যার জন্য যে বাক্য বা পদগুলি ব্যবহার করা হয় তাহাকে সমাস-বাক্য, ব্যাস-বাক্য বা বিগ্রহ বাক্য বলে।

তৃতীয় সোপান

নিম্নলিখিত বাক্যগুলি হইতে সমস্ত পদগুলি বাছিয়া সেগুলির ব্যাস-বাক্য প্রকাশ করিতে বলা হইবে।

১। কর্মের বড় পরোপকার, ধর্মের বড় দয়া।

২। ত্রিভুবনে আমার আত্মীয়-স্বজন নাই।

৩। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের আদর যত্ন করিও।

৪। ঢেঁকি ছাটা চালের ভাত খাইলে বেরিবেরি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

ঘরের কাজ

সমাসের চারিটি উদাহরণ লিখিয়া আনিতে, এবং প্রত্যেক উদাহরণ লইয়া এক একটি বাক্য রচনা করিতে বলা হইবে।

(৩)

বিদ্যালয়— ছাত্রসংখ্যা—৩০।

শ্রেণী—পঞ্চম। বয়স—১১ হইতে ১২।

বিষয়—বাংলা রচনা। সময়—চল্লিশ মিনিট।

পাঠ—ঘড়ি ও ঘণ্টার কথোপকথন।

পূর্বজ্ঞান—রচনা লিখিতে জানে; ছবি দেখিয়া গল্প ও প্রবন্ধ লিখিয়াছে।

উদ্দেশ্য—বাংলা সাহিত্য ও রচনায় উৎসাহ জন্মানো। কল্পনা-শক্তি বাড়ানো।

উপকরণ—ব্ল্যাক-বোর্ড, চক ও ঝাড়ন।

বিষয়বস্তু	প্রণালী
ভূমিকা	শিক্ষক ছাত্রদের বলিবেন ঃ মনে কর এক যাদুকর আসিয়া তাহার মন্ত্রপূত দণ্ড ঘুরাইল, আমরা সকলে ঘুমাইয়া পড়িলাম। তখন যাহাদের প্রাণ নাই তাহাদের কথাও আমরা শুনিতে পাইতেছি। স্কুলের বড় ঘড়ি ও ঘণ্টা কি বলিতেছে, কান পাতিয়া শোনা যাক। শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে বড় বড় করিয়া লিখিয়া রাখিবেন,—ঘড়ি ও ঘণ্টার কথোপকথন।
উপস্থাপন ঘড়ি ও ঘণ্টা সারাদিনের নিজের কাজকর্ম্মের বিষয় গল্প করিবে।	
সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা ও রাত্রি।	শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিবেন ঃ উহারা কিসের কথা বলিতেছে মনে হয়? শিক্ষক তাহাদের জিজ্ঞাসা করিবেন ঃ দিনটা কয় ভাগে ভাগ করা যায়? উত্তর-

বিষয়বস্তু	প্রণালী
ঘড়ি—নমস্কার, ঘণ্টা ভায়া, কেমন আছ ?	গুলি ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা হইবে। সকাল থেকে আরম্ভ করা যাক। কে প্রথমে কথা স্বরু করিবে ? সমস্ত শ্রেণীকে দুই দলে ভাগ করা হইবে,—একদল ঘড়ির পক্ষে কথা বলিবে, অন্যদল ঘণ্টার পক্ষে। এইভাবে কথা চলিতে থাকিবে।
ঘণ্টা—নমস্কার, ঘড়ি মশাই, ভালই আছি—তোমার খবর কি ?	
ঘড়ি—খবর আর কি ভাই, দশটা তো বাজে, এখনি ইস্কুলে সবার আসবার সময় হল।	
ঘণ্টা—ঐ যে দারোয়ান আমায় বাজাতে আসছে	শিক্ষক আর দুই জনকে বলিতে বলিবেন
ঘড়ি—এখনি সকলে বই শ্লেট নিয়ে পড়তে আসবে—এসে যে যার ঘরে ঢুকবে।	নিজেকে ঘড়ি মনে করিয়া দৃশ্যটি বর্ণনা কর।
ঘণ্টা—ঐ দেখ সবাই নিজের নিজের জায়গায় বসেছে, এবার প্রার্থনার ঘণ্টা পড়বে।	আর দুইজন আরম্ভ করিবে।

বিষয়বস্তু	প্রণালী
ঘড়ি—হাঁ, ঐ যে দারোয়ানও এসে পড়েছে।	
ঘণ্টা—ঘণ্টা শুনে সকলে কেমন তাড়াতাড়ি হলে এসে জড় হয়েছে, দেখেছ ?	নিজেকে ঘণ্টা মনে করিয়া দৃশ্যটি বর্ণনা কর।
ঘড়ি—হাঁ, এরপর ওরা দেড়টা অবধি পড়াশুনা করবে। হাঁ ভাই ঘণ্টা, তুমি এ ইস্কুলে কত-দিন আছ ?	
ঘণ্টা—কি জানি ভাই, কোন্ ছোট বেলায় যে এসেছি মনেই পড়ে না, তবে এখানে থাকতে আমার খুব ভাল লাগে—কত নতুন নতুন হাসিভরা মুখ দেখতে পাই। তুমিওতো ভাই অনেক দিন এখানে আছ ?	এখন ঘড়ি ও ঘণ্টা নিজের নিজের কাহিনী বলুক। এই ভাবে পরপর টিফিনের সময়ে ও চারটায় ছুটি পর্যন্ত দুইজনের কথাবার্তা চলিতে থাকিবে।
পুনরাবৃত্তি ও বাড়ীর কাজ	কথোপকথন সকলে আপন আপন খাতায় পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আনিবে।